আমার চোখে একাত্তর

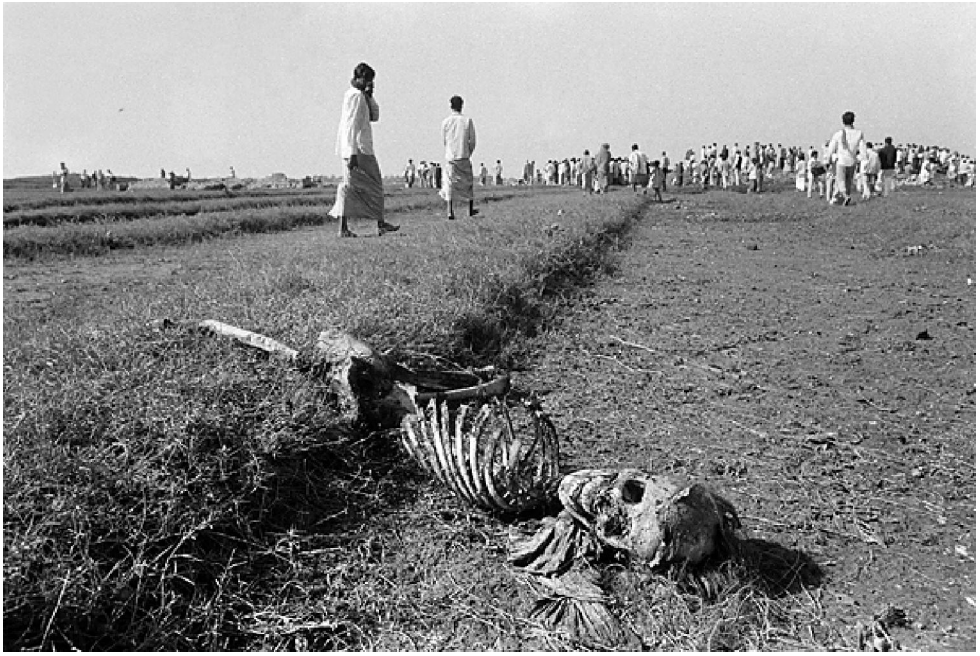

ইরতিশাদ আহমদ

মুক্তমনা ই- বুক
২০১২

আমার চোখে একাত্তর

ইরতিশাদ আহমদ

[চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, তবুও মনে হয় মাত্র সেদিনের কথা। যা নিজের চোখে দেখেছি তাকে ইতিহাস ভাবা যায় না, আমি ভাবতে পারি নি। তাই আমি যা লিখেছি তাকে ইতিহাস বলা যাবে না। স্মৃতিচারণ বলা যাবে কি? যেতে পারে, তবে এ শুধুই স্মৃতিচারণ নয়। আমার মনের অনুভূতি, আবেগ, পক্ষপাত, মতাদর্শ - সবকিছুর প্রতিফলন ঘটেছে এতে। প্রতারণাপরায়ন স্মৃতির সাথে লড়াই করতে হয়েছে নিরন্তর - সবসময় জিতেছি বলা যাবে না। তারপরেও কিছু কিছু ঘটনা যে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো মনের বর্ণিল পর্দায় এমন স্পষ্ট হয়ে আঁকা আছে দেখে নিজেই অবাক হয়েছি। স্মৃতিচারণ না হলেও লেখাটা স্মৃতিনির্ভর। লিখেছি মনের তাগিদে, স্বতস্ফুর্ততার সাথে। এতে লেখাটা সমৃদ্ধ হয়েছে না তার অঙ্গহানি ঘটেছে - বিচারের ভার পাঠকের ওপরে রইলো।

মুক্তমনা আর অভ্র না থাকলে এই লেখাটা শুরুই হতো না, আর লেখাটা শেষ হতে পেরেছে মুক্তমনার ফরিদ আহমেদ, অভিজিৎ রায় আর কেয়া রোজারিও'র উৎসাহ আর তাগাদার জন্য। তাঁদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পাওনা মুক্তমনার পাঠকদেরও, অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন আপনারাই।]

প্রথম পর্ব

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমার বয়স ছিল সতের। আমি তখন চট্টগ্রাম কলেজে এইচ, এস, সি- র ছাত্র। ঊনসত্তরে এস, এস, সি পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে ঢুকেছি। অস্থির সময়ের দাবী আর বেপরোয়া তারুণ্যের আবেগ- উচ্ছাস যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ওই বয়স যেন ওইরকম সময়ের প্রতীক্ষাতেই থাকে। আমার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া তাই নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আমি ছিলাম ছাত্র ইউনিয়ন, মেনন গ্রুপের কর্মী। দল আমাকে রিক্রুট করেনি, আমিই তাদের খুঁজে নিয়েছিলাম। এস, এস, সি পরীক্ষার প্রস্তুতিকালীন সময়েই (জানুয়ারী- মার্চ, ১৯৬৯) দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। ঊনসত্তরের বিশে জানুয়ারী আসাদ পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন। দাবানলের আগুনে যেন সারা দেশ জ্বলে উঠলো। গভীর আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে প্রতিদিন পত্রিকা পড়তাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী প্রকাশিত হচ্ছিল দৈনিক পত্রিকাগুলোতে। অধুনালুপ্ত দৈনিক *'আজাদ'* সেইসময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছিলো আসাদের ডায়েরী। এই ডায়েরী আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং শিবপুরের কৃষক সমিতির একজন সংগঠক ছিলেন।

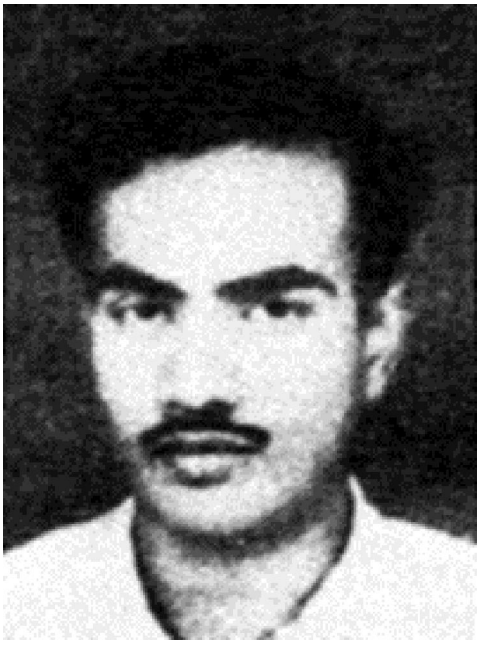

শহীদ আসাদুজ্জামান

আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া রাজনীতি আমাকে টানতে পারেনি। আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম বামপন্থীদের আন্তর্জাতিক সমাজবাদী রাজনীতির প্রতি। জাতীয়তাবাদ সাধারণ মানুষের ভাত- কাপড়ের নিশ্চয়তা দিতে পারেনা, এই বোধটা কেমন করে জানিনা সেই বয়সেই আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। তাই 'জয় বাংলা' নয়, 'জয় সর্বহারা'ই ছিল আমার পছন্দের শ্লোগান।

আসাদের পরে জানুয়ারীতেই কিশোর স্কুল ছাত্র মতিউর, এবং ফেব্রুয়ারীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহূরুল হক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জোহা নিহত হন পুলিশের হাতে। সারাদেশ জনরোষে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবসহ অসংখ্য রাজবন্দী বিনাশর্তে মুক্তি পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। আইয়ুব খান প্রথমে ঘোষনা দেন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেননা । দুদিন পরেই বললেন, তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, তিনি পদত্যাগ করছেন। দোর্দন্ড প্রতাপশালী স্বৈরাচারী একনায়কও যে জনরোষের কাছে অসহায় হয়ে অপমানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন ঊনসত্তরে আইয়ুব খান ছিলেন তারই দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে দেশে দেশে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই, আমাদের দেশেও পরবর্তীতে এমন ঘটনা ঘটেছে। দু'একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে দেখা গেছে ক্ষমতা থেকে শেষপর্যন্ত এরা অপমানিত হয়েই বিদায় নেন, সময় থাকতে সসম্মানে বিদায় নিতে এদেরকে খুব একটা দেখা যায়না।

আইয়ুব খান

অবশেষে ঊনসত্তরের পঁচিশে মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেন সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে। ক্ষমতা ছাড়ার আগে শেষ চেষ্টা হিসেবে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। শেখ মুজিব মৌলানা ভাসানীর পরামর্শ উপেক্ষা করে এই বৈঠকে যোগ দেন। এ নিয়ে ভাসানী- মুজিবের কথোপকথন ছিল বেশ মজার। মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব ভাসানীর সাথে দেখা করতে গেলে ভাসানী তাকে গোলটেবিল বৈঠকে না যেতে পরামর্শ দেন, এই বলে, "মুজিবর, তুমি পিন্ডি যাইয়োনা, আইয়ুব এখন মরা লাশ"। শেখ মুজিব নাকি বলেছিলেন, "তা হুজুর, মরা লাশের জানাযা পড়তে দোষ কি?" আন্দোলনের ওই পর্যায়ে মুজিব কেন যে আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে চাচ্ছিলেন, তা অনেকের পক্ষেই বোঝা মুস্কিল ছিল। মুক্তির পরে শেখ মুজিবকে যেদিন (ঊনসত্তরের তেইশে ফেব্রুয়ারী) ছাত্ররা সম্বর্ধনা দেয় এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে, সেদিনও জনসভাতে দাবী উঠেছিল, "গোলটেবিল না রাজপথ; রাজপথ, রাজপথ"। কিন্তু শেখ মুজিব সেই দাবীকে উপেক্ষা করে সেই সভাতেই ঘোষণা দেন, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন।

মৌলানা ভাসানী

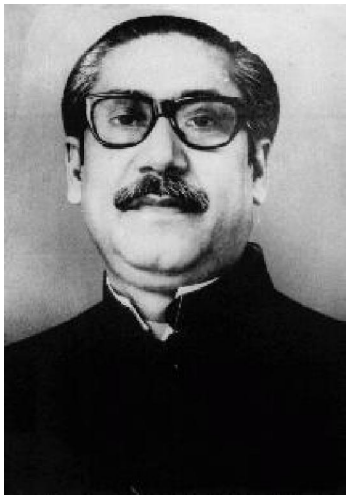

শেখ মুজিবর রহমান

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার আগে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের প্রধান রূপকার ছিলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। শেখ মুজিব নাকি এই প্রস্তাবে রাজী ছিলেন, কিন্তু বাদ সেধেছিলেন বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিব। তিনি যে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর স্বামীর যোগদানের ঘোর বিরোধী, তা সুস্পষ্ট ভাষায় আওয়ামী লীগ নেতাদের জানিয়ে দেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্ত বা ঐক্যমত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয় এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আইয়ুব-

মোনেমের পতনের পর গণমানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনার জাগরণ ঘটেছিল তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিল কিনা বাঙালি রাজনীতিকরা, সেই প্রশ্ন রয়েই যায়। এখন পেছন পানে তাকিয়ে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ঊনসত্তরের গণজাগরণকে তার যৌক্তিক পরিণতি অর্থাৎ মানুষের সার্বিক মুক্তির আন্দোলনে পরিণত করার মত নেতৃত্ব এবং সংগঠন সেদিন পুর্ব বাংলায় ছিল না। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া রাজনীতিকরা নিয়মতান্ত্রিক, নির্বাচনমুখী রাজনীতিতেই আস্থা রেখে নিজেদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে নেন। অন্যদিকে বামপন্থীদের মধ্যে যারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিচ্ছিলেন, তারা শুধু ডাকই দিয়ে যাচ্ছিলেন। জনগণকে সংগঠিত করার কোন বাস্তবোচিত কর্মসূচী তাদের ছিল না। সাধারণ জনগণ এদেরকে ঠিক চিনতোনা, মনে করতো এরা বৃটিশ আমলের সন্ত্রাসী গ্রুপের মতোই। সাধারণ মানুষ যে কম্যুনিস্ট রাজনীতি প্রত্যাখান করেছিল তা নয়, এরাই মানুষের মাঝে নিজেদের স্থান করে নিতে পারে নি। অথচ, মাওসেতুং- এর কথানুযায়ী জলের মধ্যে মাছের মতো জনগণের মাঝে কম্যুনিস্টদের মিশে থাকার কথা।

এখনও মনে আছে, এইরকম সময়ে, খুব সম্ভবতঃ সত্তরের শেষদিকে মানুষের ভীড়ে একবার আমরা লাল কালিতে ছাপানো কিছু লিফলেট ছুঁড়ে দিয়েছিলাম; এই লিফলেটে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা হয়েছিল। কিছু হতচকিত মানুষকে বলতে শুনলাম, "কোথা থেকে এলো?" আবার কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেলো, "এইতো এসে গেছে, লালেরা এসে গেছে"। আমার মনে হয় এইধরনের প্রতিক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে, কম্যুনিস্টরা তখনও সাধারণ মানুষের কাছে ছিল রহস্যাবৃত, যদিও অবাঞ্ছিত নয়। এটাও ঠিক যে, কম্যুনিস্টদের পক্ষে তখন প্রকাশ্যে রাজনীতি করাটা দুরূহ ছিল; কারণ পাকিস্তানী আমলে কম্যুনিস্ট সংগঠন করা ছিল আইনতঃ নিষিদ্ধ ।

নতুন করে সামরিক আইন জারীর পরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে কিছুদিনের জন্য হলেও। কিন্তু সে যেন ছিল ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা। সেই অবস্থাতেই আমরা কলেজে ঢুকি। কলেজে ঢুকেই মনে হলো একটা নতুন জগতে প্রবেশ করলাম। তখন রাজনীতির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নিয়েও মেতে থাকত ছাত্র- ছাত্রীরা। ক্লাসে ক্লাসে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন করার একটা হুজুগ ছিল। এই গোষ্ঠীগুলোর একটা প্রধান কাজ ছিল ম্যাগাজিন বা স্মরণিকা বের করা। বলতে দ্বিধা নেই পড়াশোনার চাইতে এইসব কাজকর্মেই আমাদের উৎসাহ ছিল বেশী।

তখন চট্টগ্রাম কলেজে মূলতঃ চারটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন সক্রিয় ছিল। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ (পিকিংপন্থী মেনন গ্রুপ আর মস্কোপন্থী মতিয়া গ্রুপ), এবং ইসলামী

ছাত্র সংঘ। কি কারনে জানিনা, ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপের মধ্যেই পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল, ছাত্রীদের কাছেও এই দুই গ্রুপ ছিল অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এদের মধ্যে আবার মতিয়া গ্রুপে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য ছিল চোখে পড়ার মত। এরই বা কি কারণ ছিল আমার জানা নেই। সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চায়ও ছাত্র ইউনিয়ন, বিশেষ করে মতিয়া গ্রুপ ছিল এগিয়ে। অনেকে এই গ্রুপটাকে ঠাট্টা করে 'হারমোনিয়াম পার্টি' বলতো। তবে ব্যাপক ছাত্র সমর্থনের বিচারে ছাত্রলীগ ছিল সব চাইতে বেশী জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠন। ছাত্রসংসদের নির্বাচনে ছাত্রলীগই জিততো। সংখ্যায় অল্প হলেও ইসলামী ছাত্র সংঘে কিছু নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী ভাবাদর্শের প্রতি অনুগত কিন্তু স্বভাবতই ধর্মান্ধ এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতাকর্মী ছিল। এদের অনেকেই পরে একাত্তরে আলবদর- রাজাকার হয়ে মানুষহত্যার উৎসবে মেতে উঠেছিল - ভাবলে অবাক লাগে, কষ্ট হয়। ছাত্র সংঘের মধ্যে ছাত্রীকর্মী ছিলনা বললেই চলে।

এইসময়ে আমরা, ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের এইচ,এস,সি- র ছাত্রছাত্রীরা সত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে 'এক ঝলক আলো' নামে একটা স্মরণিকা বের করেছিলাম। আমাদের মতিয়া গ্রুপের বন্ধুরা বের করেছিল 'অতন্দ্র' নামে স্মরণিকা। বাংলা বিভাগের তরুণ শিক্ষক হুমায়ুন আজাদ দুটো ম্যাগাজিনেই তাঁর কবিতা দিয়েছিলেন। কেমন করে জানিনা, আজ এতদিন পরেও মনে রয়ে গেছে আমাদেরকে দেওয়া তার 'লাল ট্রেন' কবিতাটির শেষ ছত্রটি – "লাল ট্রেন ভাত হয় পাতে, কাঁথা হয় রাতে"। হয়তো তার কবিতার লাল ট্রেনটি ছিল রূপকার্থে একটি বিপ্লবী সমাজব্যবস্থা, যার মধ্যে আছে সাধারণ মানুষের সাধারণ সমস্যার সমাধান। অতন্দ্র- এ ছাপানো তাঁর কবিতাটির নাম ছিল 'অলৌকিক ইস্টিমার'। পরে এই নামেই স্যারের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে এলাম, আবার ফিরে যাই ইতিহাসে। এরই মধ্যে সত্তরের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খান পাঁচ দফা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এল, এফ, ও) ঘোষনা করেন। এল, এফ, ও- র দফাগুলি ছিল অপমানজনক এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। যেমন, বলা হয়েছিল, নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান প্রেসিডেন্টের পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত অনুমোদিত হবেনা। তবুও আওয়ামী লীগসহ বড় বড় সব রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশ নিতে রাজী হয়ে গেল।

ইয়াহিয়া খান

এই সময়ে অর্থাৎ সত্তরের জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারীতে বামপন্থীদের একটা প্রভাবশালী অংশ, নির্বাচনের রাজনীতি বর্জন করে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। এরা চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত এবং মৌলানা ভাসানীর আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। সংখ্যায় অল্প এবং নানা ভাগে বিভক্ত হলেও এরাই প্রথম পূর্ব বাংলাকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আওয়ামী লীগ, এমন কি সোভিয়েতপন্থী সমাজতন্ত্রীরাও তখন বিচ্ছিন্নতার দাবীকে হঠকারিতা মনে করতো। যদিও পরে শোনা যায়, ষাটের দশকেই ছাত্রলীগের মধ্যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটা নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে প্রখ্যাত রাজনীতিক এবং সাংবাদিক নির্মল সেন- এর মতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কিছুটাও যদি সত্যি হয়, তবে এটাও মানতে হয় যে আমলা এবং সামরিক বাহিনীর কিছু কিছু বাঙালি সদস্য ষাটের দশকের শেষের দিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়

সক্রিয় ছিলেন [১] । এরা এমন কি গোপনে সশস্ত্র কর্মসূচী নিতেও দ্বিধান্বিত ছিলেন না। এই ধরনের কর্মসূচীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পৃক্ততা ছিল কিনা তা সন্দেহাতীতভাবে জানা না গেলেও দল হিসাবে আওয়ামী লীগ বা অন্যকোন রাজনৈতিক দল যে মোটেও আগরতলা টাইপের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলনা, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

একাত্তরের মার্চে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হামলা এটাই প্রমান করে যে, সত্তরের প্রথমার্ধেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করাটা সঠিক ছিল। কিন্তু বামপন্থীরা সঠিক তত্ত্ব দিতে সক্ষম হলেও তাদের না ছিল সংগঠন, না ছিল নেতৃত্ব। আগেই বলেছি ব্যাপক জনগণের কাছে এদের গ্রহনযোগ্যতাও তেমন ছিল না। ঠিক এইসময়েই পশ্চিম বাংলায় নক্সালবাড়ীর কম্যুনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়। পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্টরাও এর প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারলেন না। শ্রেণী শত্রু খতমের লাইনের পক্ষে- বিপক্ষে শুরু হয়ে গেল তুমুল বিতর্ক। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচী সামনে রেখেও তাই বেশ কয়েকটি বামপন্থী গ্রুপ একই সাথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীকেও (দু'একটা গ্রুপ আবার নক্সালবাড়ীর অনুকরণে কৃষি বিপ্লবেরও ডাক দিতে শুরু করে) সামনে নিয়ে আসেন। এখন বুঝতে পারছি পূর্ব বাংলার বামপন্থীরা এইসময়ে এক মারাত্নক ভুলের পথে পা দিয়েছিলেন।

শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি আর প্রধান দ্বন্দ ও মূল দ্বন্দ নিয়ে নানারকমের তাত্বিক তর্ক-বিতর্কের ফলে চীনপন্থী কম্যুনিস্টরা তিন- চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। আমি সম্পৃক্ত থাকি কাজী জাফর- হায়দার আকবার খান রনো- রাশেদ খান মেনন- এর নেতৃত্বাধীন অংশের সাথে। এরা গঠন করেন, 'কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। অন্যান্য কম্যুনিস্ট সংগঠনের মতো এটিও ছিল গোপন। আগেই বলেছি, তখন প্রকাশ্যে কম্যুনিস্ট কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ ছিল। প্রকাশ্যে কাজী জাফর এবং হায়দার আকবর খান রনো শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে আর রাশেদ খান মেনন কৃষক সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল, 'পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন'। মূল শ্লোগান ছিল 'মেহনতী জনতার সাথে একাত্ন হও'। মূল দলের শ্লোগান ছিল, 'শ্রেণী সংগ্রামকে ভুলিওনা' আর 'শ্রমিক- কৃষক অস্ত্র ধর, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েম কর'। তখন চট্টগ্রামে আব্দুল্লাহ আল- নোমান, কাজী সিরাজ, সৈয়দ শফিকউদ্দিন আহমেদ, মোজাম্মেল হক প্রমূখ এই দলে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

এইরকম সময়ে একবার আমাদের কয়েকজনের সাথে কাজী জাফর আহমদ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। কাজী জাফর এবং রাশেদ খান মেনন তখন হুলিয়া মাথায় নিয়ে পলাতক জীবন যাপন করছেন। আমরা বলতাম, আন্ডারগ্রাউন্ডে আছেন। পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা দাবী করার অপরাধে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ইয়াহিয়ার সরকার সামরিক আদালতে তাঁদেরকে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে। এখনো মনে আছে এই বৈঠকে আমি তাঁকে হত্যার রাজনীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। জাফর ভাই প্রথমে একটু হাসলেন, কি ভাবলেন জানিনা। হয়তো ভেবেছিলেন, বলে কি এই পুঁচকে ছেলেটা! কিম্বা কি জানি হয়তো মনে মনে এই ধরনের প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন বলেই হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "শুধু হত্যা করলেই চলবেনা, মানুষকে সচেতন করে, তাদের সমর্থন নিয়ে, তাদেরকে সাথে নিয়ে, তাদের মধ্যে শ্রেণী হিংসা জাগ্রত করেই শ্রেণীশত্রু খতমের কাজ হাতে নিতে হবে"। উত্তরটা তখন আমার কাছে মোটামূটি গ্রহনযোগ্য মনে হয়েছিল।

টংগীর শ্রমিক, প্রগতিশীল ছাত্রদের একটা অংশ, আর দেশের কিছু কিছু এলাকার কৃষকদের মধ্যে এই দলটির এবং এর নেতাদের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও সাধারণ জনগণের ওপর এঁদের তেমন কোন প্রভাব ছিলনা। এখনও মনে আছে আমার এক সহপাঠী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমাকেতো মনে হয় খুবই রাজনীতিসচেতন, কিন্তু তুমি কোন দলের রাজনীতি কর"? বলা দরকার, বন্ধুটি ছাত্র সংগঠনের নয়, জানতে চাচ্ছিলো মূল দলের নাম। আমি সদ্যগঠিত 'কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'- র নাম বললাম। শুনে তার ছোট্ট সকৌতুক মন্তব্য ছিল, "বাহ, এত লম্বা নাম!"

নাম লম্বা হলেও এবং গোপন সংগঠন হওয়ার কারণে মানুষের মাঝে তেমন পরিচিতি না থাকলেও এঁদের রাজনীতি তখন আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছিল। এই দলটির তরুন এবং গতিশীল নেতৃত্ব আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। একদিকে এঁরা অর্থাৎ বামপন্থীদের স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলি নির্বাচন বর্জন করে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিতে থাকে আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা (উঠতি ধনিক শ্রেণী) ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী নিয়ে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। সত্তরের ডিসেম্বরে সারা পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়।

বামপন্থীদের কর্মসূচীবিহীন শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বসর্বস্ব রাজনীতি একদিকে যেমন তাঁদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে, অন্যদিকে তেমনি আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগ ছিল বাঙালি উঠতি ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী ও স্বার্থরক্ষাকারী, মধ্যবিত্তের সমর্থনপুষ্ট, জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সহানুভূতি পাওয়া একটি দল। সাধারণ, অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত, মানুষের (কৃষক- শ্রমিক- মজুর) ওপর সমাজের এই অংশগুলির সামাজিক প্রভাবের ফলে আওয়ামী লীগ পায় ব্যাপক জনসমর্থন। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা হয় আকাশচুম্বী। ছয়দফা পায় অভূতপূর্ব গ্রহনযোগ্যতা। 'জয় বাংলা' শ্লোগানে আকাশ- বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। এর বিপরীতে 'জয় সর্বহারা' এবং 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগানগুলি মানুষের মাঝে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়।

নির্বাচনের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ছাড়াও মস্কোপন্থী (মোজাফফর) ন্যাপ এবং ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, এবং পিডিপি (নুরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন) অংশ নেয়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ভূট্টোর পিপলস পার্টির তেমন কোন সংগঠন ছিলনা। মোজাফফর ন্যাপ ইতিপূর্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রতি আহবান জানায়। এর উত্তরে শেখ মুজিব তাদেরকে সাইনবোর্ড পাল্টে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে বলেন। আমার মনে হয় এই সময়ে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তার বলে বলীয়ান হয়ে নিজেদের শক্তিতে ছিল প্রচন্ড রকমের আস্থাবান, এবং এর ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ একলা চলার নীতি গ্রহন করেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে নির্বাচনের ফলাফল প্রমান করে, তাদের এই আস্থা ভিত্তিহীন ছিলনা।

কিন্তু হিসেবে গরমিলটা ছিল অন্য জায়গায়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিশ্বাস ছিল ভোটে জিতে তারা পাকিস্তানের জন্য ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবে; না পারলেও প্রয়োজন হলে ক্ষমতায় গিয়ে বিনা রক্তপাতে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে। তাদের মাথায় এই চিন্তা কখনোই আসেনি যে, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হতে পারে, না চাইলেও এই যুদ্ধ বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতে পারে। তাই এমন কি, ঘটনা অনেকদূর গড়িয়ে যাওয়ার পরেও, শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক সাতই মার্চের (একাত্তরের) ভাষনে বলেছিলেন, 'রক্ত আরো দেবো,' বলেছিলেন ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে। ত্যাগের কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন আত্মরক্ষার কথা, কিন্তু বলেন নি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। তিনি তখনও পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালিদের দাবীদাওয়া আদায়ের কথা ভাবছিলেন। আমি জানি বলা হবে, শেখ মুজিবের পক্ষে গেরিলা যুদ্ধের নেতা হওয়া সম্ভব ছিলনা, আর আওয়ামী লীগ কোন বিপ্লবী দলও ছিলনা। তা ছিলনা ঠিকই। এবং ছিলনা বলেই একত্তরের যুদ্ধ পুরোপুরি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ছিলনা, যুদ্ধের শুরু এবং শেষ আওয়ামী লীগের ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়নি। শুরু করেছিল পাকিস্তানীরা, আর শেষ করেছিল ভারতীয়রা। স্বাধীনতা আমাদের, বিজয়ও আমাদের, কিন্তু স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবস কোনটির নির্ধারণে আমাদের বাঙালিদের এবং নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের ভুমিকা মূখ্য ছিলনা।

আবার ফিরে যাই সত্তরের পূর্ব পাকিস্তানে। একদিকে আওয়ামী লীগের ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে নির্বাচনের প্রস্তুতি, আর মস্কোপন্থী সমাজতন্ত্রীদের পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক, আর অন্যদিকে পিকিংপন্থী সমাজতন্ত্রীদের নির্বাচন বর্জন ও শ্রেণী শত্রু খতমের লাইন, এবং একইসাথে স্বাধীন পূর্ব বাংলায় জনগণতন্ত্র কায়েমের আহবান, এই ছিল তখনকার বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট। এর মধ্যে ক্ষীণ হলেও জামাতে ইসলামীর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ছিল দৃশ্যমান। মুসলিম লীগ আর নেজামে ইসলামীর রাজনৈতিক লাইনও ছিল ধর্মভিত্তিক। সাধারণ মানুষের মধ্যে এদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল অল্প। এদের মধ্যে জামাতে ইসলামীর কর্মীবাহিনী ছিল বেশ সুসংগঠিত। এরাই ছিল তখনকার পূর্ব বাংলায় "অখন্ড পাকিস্তান"পন্থী - যাদের মন- মানসিকতায় ছিল সাম্প্রদায়িকতা - যদিও তারা তখন কোণঠাসা এবং সঙ্গত কারণেই খুব একটা সরব নয়।

এর মধ্যেই এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটে যায় সত্তরের বারোই নভেম্বরে। সেদিন ভোর বেলায় এক প্রলয়ংকরী ঝড় প্রচন্ড জলোচ্ছাসের সাথে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের প্রানহানি ঘটে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এই ঝড়ের পর রাজনীতিতে গূণগত পরিবর্তন সূচিত হয়।

আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক পরেই সাধারণ নির্বাচন। ঊনিশশো সত্তরের ডিসেম্বরে, সাত তারিখে।

তথ্যসূত্র – দ্বিতীয় পর্ব

[১] নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ ৪০২।

তৃতীয় পর্ব

সত্তরের বারোই নভেম্বর যেন কেয়ামতের দিন ছিল পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে। রাতের অন্ধকারে বিশ থেকে পঁচিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছাস নিমেষে ডুবিয়ে দেয় দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যুর বিভীষিকায় হতবুদ্ধি হয়ে যায় পূর্ব বাংলার জনগণ। ফেটে পড়ে বিক্ষোভে। খবরের কাগজে শিরোনাম হয়, 'কাঁদো বাঙ্গালী কাঁদো'। বীভৎস সব ছবি আর খবর আসতে থাকে উপদ্রুত অঞ্চল থেকে। মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের বাইরে ছিলেন। এসেই লোকদেখানো হাওয়াই চক্কর দিলেন হেলিকপ্টারে চড়ে, ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকাগুলির ওপর দিয়ে। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের কেউই, এমনকি বাঙালি সদস্যরাও, ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। ক্ষোভ পরিণত হতে থাকে ক্রোধে।

১২ই নভেম্বরের সাইক্লোন, ১৯৭০

এর আগে পর্যন্ত দেশের অবস্থা সামরিক আইন সত্ত্বেও মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে এবং সভা- সমিতি অনুষ্ঠানে তেমন কড়াকড়ি বাধানিষেধ ছিল না। ইয়াহিয়া সরকার নামমাত্র মূল্যে সিনেমা হলগুলিতে ছাত্রদের ছবি দেখার সুযোগ করে দেয়। আইডেন্টিটি কার্ড দেখালেই কম দামে টিকেট কেনা যেত। সামরিক সরকারকে এই বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল কে জানে! উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের রাজনীতি- বিমুখ রাখা। কারণ আটষট্টি- ঊনসত্তরের গণ- অভ্যুত্থানের নায়ক ছিল ছাত্ররা। তাদের ধারনা ছিল বেশি বেশি করে সিনেমা দেখলে ছাত্ররা আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেনা, আন্দোলন- সংগ্রামে উৎসাহী হবেনা। বলিহারি বুদ্ধি বটে! তবে এটা ঠিক যে, ওই সময়ে সিনেমা হলে গিয়ে আমি যত ছবি দেখেছি, পরের দশ বছরেও অতটা দেখিনি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য দু'টি বাংলা ছবি হলো, 'জীবন থেকে নেয়া', আর 'বিন্দু থেকে বৃত্ত'। 'জীবন থেকে নেয়া' ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের দাবীকে থিম করে জহির রায়হানের একটা প্রতীকধর্মী চলচ্চিত্র। 'আমার সোনার বাংলা', 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানগুলি এই ছবিতে ছিল। এই ছবিটা তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' দর্শকপ্রিয় ছবি হতে পারেনি। কিন্তু এই ছবিটাকে আমি আমার দেখা গুটিকয়েক ভাল ছবির মধ্যে একটা বলে মনে করি। মনে পড়ে, চাটগাঁর সিনেমা প্যালেসে আমি পরপর দুইদিন ছবিটা দেখেছিলাম। ছবিটা প্রযোজনা করেছিলেন ফখরুল আলম আর পরিচালনায় ছিলেন রেবেকা। 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' টাইপের মধ্যবিত্ত জীবনে 'প্লেন লিভিং হাই থিংকিং'এর মাহাত্ম্য ছিল এই ছবির থিম। সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল।

ছবির কথা থাক, নির্বাচনের কথায় ফিরে আসি।

নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল বিস্ফোরণোন্মুখ। বারোই নভেম্বরের ঝড় যেন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই বিস্ফোরণটাকেই ঘটিয়ে দিল। নির্বাচন নিয়ে মানুষের মাঝে যে উৎসাহ- উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা পরিণত হলো বিক্ষুদ্ধ উত্তেজনায়। নির্বাচনের আর প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে শুধু সংবাদপত্র আর রাজনীতিকরাই নয়, সাধারণ মানুষও প্রকাশ্যে আলোচনা করতে শুরু করলো। ঝড়ের কারণে নির্বাচন পেছানোর কথাও উঠলো।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নেতারা চিন্তিত হলেন। নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা তাদের ভাবিয়ে তুললো। নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা যে নির্বাচনে, তা পিছিয়ে যাক এটা তাদের কাম্য ছিল না। কোন একটা দৈনিক পত্রিকায় এক উপসম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল, 'শেখ মুজিবের সাথে প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতকতা'। শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন,

"আরো দশহাজার মানুষের মৃত্যু হলেও নির্বাচন পিছাতে দেয়া হবে না" [১]। তখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা যে পাঁচ লাখের কাছাকাছি তা জানা ছিল না। কয়েক হাজার মাত্র মারা গেছে, মনে হয় এই ধারনার বশবর্তী হয়েই শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্যটা করেছিলেন। এই মন্তব্য যে খুব একটা সংবেদনশীল ছিল না, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বারোই নভেম্বরের ঝড় শেখ মুজিবকে তাৎক্ষণিক ভাবে চিন্তায় ফেললেও, পরে দেখা গেল এই ঝড়ের পরিণতিতে আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সারাদেশে নির্বাচন পূর্বনির্ধারিত তারিখেই (সত্তরের সাতই ডিসেম্বরে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, উপকূলের কয়েকটি নির্বাচনী এলাকা বাদ দিয়ে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ঐতিহাসিক জয়। আওয়ামী লীগ জিতবে এই ধারনা মোটামুটি সবারই ছিল, কিন্তু এত ভোট পেয়ে এতগুলি আসনে জিতবে, তা ছিল অচিন্তনীয়, অনেকেরই কল্পনার বাইরে। আওয়ামী লীগের বিশাল নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে বারোই নভেম্বরের ঝড়ের বিরাট প্রভাব ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

কোন কোন বিদেশী সাংবাদিকদের সাম্প্রতিক লেখায় দেখি বলা হয়, এই ঝড়ের কারণেই পুর্ব পাকিস্তান পশ্চিমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেন এই ঝড়টা না হলে বাংলাদেশ হতো না। এই বিশ্লেষণ অতি সরলীকৃত এবং ভুল ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ধরনের ভুল বিশ্লেষণই প্রমাণ করে এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ।

নির্বাচন পেছানোর ব্যাপারে শেখ মুজিবের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তিনি যে একজন কৌশলী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই । এই নির্বাচনে জিততে পারলেই যে তিনি পুর্ব বাংলার একচ্ছত্র এবং অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হতে পারবেন এটা তাঁর মতো করে আর কেউই তেমন বুঝতে পারে নি। যদিও শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তখনই আকাশছোঁয়া, তিনি জানতেন শুধু জনপ্রিয়তা দিয়ে কাজ হবেনা। নির্বাচনে জয়লাভের ফলে যে গ্রহণযোগ্যতা তিনি পাবেন তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শুধুমাত্র দেশবাসীই নয়, সামরিক সরকারও এর ফলে তাঁকে জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হবে। তাঁর এই ধারণা যে সঠিক ছিল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাই প্রমাণ করে।

মৌলানা ভাসানী ও তাঁর সমর্থকরা আগেই নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন, বারোই নভেম্বরের পরে আর রাখঢাক করলেন না। সোজাসুজি স্বাধীনতার ডাক দিলেন।

এই সময়ে মৌলানা ভাসানীর ভুমিকা তাঁকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। তিনি যেন মানুষের কথাই বলছিলেন। ঝড়ের আগে তাঁর দেয়া শ্লোগান 'ভোটের আগে ভাত চাই' তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। এই শ্লোগানটি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা বাস্তবোচিত ছিল বলেও মনে হয় না। কিন্তু ঝড়ের পরের স্বাধীনতার ডাক মানুষ লুফে নিয়েছিল। এমন কি তখন আওয়ামী লীগের মিটিং- মিছিলেও স্লোগান উঠতো, 'ছয় দফা না, এক দফা; এক দফা, এক দফা'। এক দফার অর্থ ছিল স্বাধীনতার দাবী। মৌলানা ভাসানী অবশ্য বলতেন, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চাই'। তাঁর যুক্তি ছিল, ঊনিশশো চল্লিশের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলার মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী এখনো তোলা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, স্বাধীনতার দাবীর প্রতি মানুষের সায় থাকলেও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ভাসানী অবশ্য সাধারণ মানুষের ভাষায় যুক্তিটা দিতেন এই ভাবে, "পাকিস্তান আনছি আমরা, পাকিস্তান আমাদেরই থাকবে, আমরা আলাদা হইতেছিনা, তোমরাই বাইর হয়া যাও"। এই সময়কার জনসভাগুলিতে মৌলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গালীরা কি কি ত্যাগ স্বীকার করেছে তার ফিরিস্তি দিতেন। পশ্চিম বাংলার পাটকল থেকে মালদহের আম কিছুই তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়তো না। বামপন্থীরাও (মস্কোপন্থীরা ছাড়া) এই সময়ে স্বাধীনতার দাবীকে সামনে নিয়ে আসতে থাকে জোরেশোরে। এই সময়ে আমাদের শ্লোগান ছিল, 'আসাদের মন্ত্র, জনগণতন্ত্র'; 'কৃষক- শ্রমিক অস্ত্র ধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর'। লক্ষ্যনীয় যে, বামপন্থীরা ভাসানীর পেছনে থাকলেও, তাদের বেশীর ভাগই পূর্ব পাকিস্তান নয় পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন।

তবে আমার ধারনা, ভাসানীর 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবীর পেছনে অন্য একটা কারণ ছিল। ভাসানী তখন থেকেই ভারতকে নিয়ে সন্দিহান ছিলেন । আমাদের স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়ায় ভারত অযাচিত এবং স্বার্থপর প্রভাব খাটাতে পারে তাঁর এই আশংকা ছিল। আশংকাটা অমূলক ছিল না নিশ্চয়ই। ভাসানীও অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ছিলেন। যুদ্ধের নয় মাস তাঁকে ভারতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে হয়েছিল, এতে কি প্রমাণিত হয়?

শেখ মুজিবও বা কেন একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে সুযোগ থাকা সত্বেও তার দলের অন্যান্য নেতাদের মতো সীমান্ত পার হয়ে ভারতে সরে যাওয়ার চাইতে পাকিস্তানীদের হাতে ধরা দেওয়াটাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন এ প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। ভারতে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিব এক পা বাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন না, এতো আজ সবারই জানা। সম্প্রতি প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর একটা লেখা থেকে জানা যায় [২], ভারতীয়

কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের পূর্ব- অভিজ্ঞতা শেখ মুজিবের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না শেখ মুজিব ভারতের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি।

মৌলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব দু'জনেই চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। শুধু জড়িত ছিলেন বললে সবটাই বলা হয় না; বলা উচিৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাদের দু'জনেরই অত্যন্ত সক্রিয় এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। একজন যৌবনে আর একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে সে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের ভাবাবেগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস ও তার স্মৃতির সাথে জড়িয়ে ছিল, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে সত্তরের পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছাত্রদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ঊনসত্তরে ছাত্রদের এগারদফা ছয়দফাকে ছাপিয়ে গণমানুষের দাবীতে পরিণত হয়। এগারদফা ছিল চারটি ছাত্র সংগঠন (দুই ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও এন, এস, এফ এর একটা অংশ) ও ডাকসুর সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রণীত কর্মসূচী। এই ছাত্রদের কারোরই, এবং তখনকার অনেক তরুণ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেরই, পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে জন্মই হয় নি। কারো কারো হয়ে থাকলেও, তাদের বয়স তখন এতই অল্প ছিল যে, পাকিস্তান আন্দোলনের তেমন কোন প্রভাব তাদের উপর পড়েনি। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানকে নিয়ে এদের মাঝে কোন আবেগ বা পিছুটান ছিল না।

সত্তর- একাত্তরের পূর্ব বাংলায় রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে বুঝতে হলে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যাক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীসমুহের মন- মানসিকতার এই দ্বন্দ- সংঘাতগুলিকেও সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ।

তথ্যসূত্র – তৃতীয় পর্ব

[১] নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ ২৬১।
[২] Afsan Chowdhury, "Sheikh Mujib: Three Phases, two histories, one puzzle," Forum, *the Daily Star*, Vol. 3, Issue 4, April 2008.

চতুর্থ পর্ব

পচিশে মার্চের সেই বিভীষিকাময় রাত্রির ঘটনা, আর একাত্তরের যুদ্ধে ভারতের ভুমিকা পরে আবার আলোচনায় আসবে। এখন ফিরে যাওয়া যাক ঝড়ের পরের আর নির্বাচনের আগের সময়টাতে।

আগেই বলেছি, ঝড়ের পরে পুর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যায়। নের্তৃত্বের পরিপক্ক দিক- নির্দেশনার বদলে মানুষের স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদী মনোভাবের প্রভাব রাজনীতিতে বেশি বেশি করে পড়তে শুরু করে। 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে 'পূর্ব বাংলা' আর 'বাংলাদেশ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে পত্র- পত্রিকায় এবং রাজনৈতিক মহলে। বেশ কয়েকটি ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের নাম থেকে পাকিস্তান শব্দটা ইতিমধ্যে উঠে গেছে।

ঝড়ের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের প্রসঙ্গ বেশি প্রাধান্য পেতো। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামের একটি পোস্টার মানুষের মনে দারুণ প্রভাব ফেলে। এই পোস্টারে দেশের দুই অংশে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তুলনামূলক দামের একটা তালিকা দেয়া ছিল। কিন্তু ঝড়ের পরে এই ধরনের সুপরিকল্পিত চিন্তাপ্রসূত প্রচারণা আর দেখা যায় নি। তখন আওয়ামী লীগের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্ব এবং ছাত্রলীগের জঙ্গী অংশটা সামনে আসতে থাকে। এই সময়ে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্যরা 'মুজিব কোট' পরে শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের প্রতীকি আনুগত্য প্রকাশ করতো।

'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'আমার দেশ, তোমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ', এবং 'জয় বাংলা' স্লোগানগুলি এদের মুখে বেশি বেশি শোনা যেতে থাকে। দেশাত্মবোধক বাংলা গানগুলি পায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আমাদের আজকের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' এই সময়ে গাওয়া হতো প্রায় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক কর্মসূচীতে। আমি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলির কথাই বলছি, জামাত- মুসলিম লীগের কথা নয়। আরো গাওয়া হতো, 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'ধনে ধান্যে পুস্পে ভরা', আর 'ও আমার দেশের মাটি', এই গানগুলি। দেশপ্রেম আর রাজনৈতিক সচেতনতার একটা জোয়ার বইছিল যেন সেই সময়ের পূর্ব বাংলায়। জাতীয়তাবাদী চেতনায় সারা দেশ হয়ে উঠেছিল উজ্জীবিত।

এই জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে ছিল ভাষা, চল্লিশের দশকের মতো ধর্ম নয়। তাই প্রথম থেকেই এই চেতনার চরিত্র ছিল সেক্যুলার বা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। তখন মনে হয় সাধারণ মানুষের উপর প্রগতিশীল, সেক্যুলার ধ্যান- ধারনার প্রভাব আজকের তুলনায় বেশি ছিল। ভাবতেও অবাক লাগে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে একাত্তরে আলাদা দেশ পেয়েও এই ক'বছরে আমরা কতটা পিছিয়ে গেছি।

পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের দাবীও সামনে আসতে থাকে। রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্র জনপ্রিয় হতে শুরু করে আটষট্টি- ঊনসত্তরের আন্দোলন থেকে। এই আন্দোলনের সূচনা করেন মৌলানা ভাসানী আর তার অনুসারীরা। কৃষক সমিতির হাট- হরতালের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সারা পাকিস্তানব্যাপী গণজাগরণের। আটষট্টির ডিসেম্বরে আসাদুজ্জামান মনোহরদির হাতিরদিয়ায় হাট- হরতালের সময় পুলিশের আক্রমণে আহত হয়ে ঢাকায় আসেন পত্রিকায় খবর দিতে। সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে কোন পত্রিকাই সে খবর ছাপাতে রাজী হয় নি। প্রখ্যাত সাংবাদিক- রাজনীতিক নির্মল সেন তার স্মৃতিচারণায় জানাচ্ছেন, তিনিও আসাদের দেয়া খবর ছাপাতে পারেন নি। আক্ষেপ করে লিখেছেন, মাত্র সপ্তাহ তিনেকের মাথায় ঊনসত্তরের বিশে জানুয়ারী আসাদ আবার আসেন – খবর দিতে নয়, খবর হয়ে পত্রিকার পাতায়, বীরের মতো মৃত্যুকে বরণ করে। এইবার আর তাঁকে উপেক্ষা করতে পারে নি কোন সংবাদপত্র।

এই সময়ে ভাসানী তার অভিনব ঘেরাও আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এই সময়েই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে অধিকার- সচেতনতার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। থানা ঘেরাও, তহসিলদার ঘেরাও- এর মত দুঃসাহসিক কর্মসূচী নিতে দেখা যায় গ্রামবাংলার কৃষকদের। ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের মত তারাও পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সংগঠিত হতে শুরু করে। 'কেউ খাবে, কেউ খাবেনা, তা হবেনা, তা হবেনা' এই শ্লোগানটি সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বভাবজাত দোদুল্যমানতা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির অপপ্রচার সত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ এবং সমর্থন বাড়তে থাকে। কম্যুনিস্ট এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি - মস্কোপন্থী- পিকিংপন্থী নির্বিশেষে, পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতায় লিপ্ত থাকা সত্বেও - সমাজতন্ত্রের দাবীকে সাধারণ মানুষের মাঝে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত এবং ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন।

বামপন্থীরা রাষ্ট্র- ক্ষমতায় যেতে পারে নি, কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' থেকে 'মুক্তিযুদ্ধে' পরিণত করার কৃতিত্ব তাদেরই। সাধারণ মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তি

অর্জনে সফল না হলেও বামপন্থীদের এই অর্জনকে খাটো করে দেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, পঁচাত্তর- পরবর্তী বাংলাদেশে এই অর্জনকে টিকিয়ে রাখা যায় নি।

সেই সময়ে, এমন কি আওয়ামী লীগও নির্বাচনী প্রচারণায় শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করে। মার্কিনঘেঁষা সোহরাওয়ার্দী- মানিক মিয়া প্রভাবিত আওয়ামী লীগে এই পরিবর্তন ছিল চোখে পড়ার মত। শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য, যদিও শেখ মুজিব তাঁর নেতার তুলনায় গণমানুষের অনেক কাছাকাছি ছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, আওয়ামী লীগেও বামধারার রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং বামপন্থী নেতারা সামনে আসতে থাকেন তখন থেকেই, শেখ মুজিবের ব্যাক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব সত্বেও। ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, শেখ মুজিব নিজেই হয়তো এই সময়ে বামধারার প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেন।

হয়তো তাই শুধু স্বাধীনতা নয়, মুক্তির কথাও তিনি একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন তার ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বক্তৃতায়।

এর আগে আওয়ামী লীগ কৃষক- শ্রমিকদের দাবীদাওয়াকে খুব একটা সামনে আনতোনা। ছয় দফায় কৃষক- শ্রমিকদের কোন কথাই নাই। ব্যাপারটা একেবারেই তাৎপর্যহীন নয় যে, সত্তরের আগে পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন 'শ্রমিক লীগ' গঠিতই হয় নি। আওয়ামী লীগ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত, উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর দল। যদিও ছেষট্টির সাতই জুন ছয় দফার দাবীতে যে হরতাল হয়, তাতে গুলিতে প্রাণ হারান আরো কয়েকজনের সাথে মনু মিয়া নামে একজন শ্রমিক ।

আগে উল্লেখ করেছি, ছাত্রদের এগার দফার কথা। ঊনসত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রদলগুলি একজোট হয়ে এগার দফা প্রণয়ন করেন। ছয় দফার তুলনায় এগার দফা ছিল অনেক বেশি প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এগার দফায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীর চাইতে গণমানুষের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পায় বেশি। এগার দফা ছিল সমাজতন্ত্রের পক্ষে, প্রগতিশীল ছাত্রদের একটা বিরাট বিজয়।

সত্তরের পূর্ব বাংলা ছিল নির্বাচনের অপেক্ষায় উম্মাতাল। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম 'এক ব্যাক্তি এক ভোটে'র নীতিতে সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ - অখন্ড পাকিস্তানের ইতিহাসে সেই একবারই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে যাই ঘটুক, সত্তরে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে সারা পাকিস্তানের জনগণ

ছিল ঐক্যবদ্ধ। গনতন্ত্রের দাবীতেই আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

সত্তরের রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা পরিণত হয় আমাদের 'মুক্তিযুদ্ধে'র মূলমন্ত্রে। পরবর্তীতে বাহাত্তরে যা স্থান পায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে চার মূলনীতি হিসাবে - এবং আরো পরে কতিপয় অতি উৎসাহী এবং সুযোগসন্ধানী চাটুকারদের দ্বারা তথাকথিত 'মুজিববাদে'র চার স্তম্ভ রূপে।

ঝড়ের পর থেকে স্বাধীনতার দাবীতে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী সোচ্চার হলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু চেয়েছিল শেখ মুজিবের দিকেই। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতে ম্যান্ডেট তুলে দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ ছিল না। সাধারণ মানুষ দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্যালটকেই অস্ত্র হিসাবে নিয়েছিল, এবং সেই অস্ত্র একযোগে প্রয়োগ করেছিল। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের কাছে ডানপন্থী দলগুলোর বাঘা বাঘা নেতারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। মুসলিম লীগের সবুর খান এবং ফকা চৌধুরী, জামাতের গোলাম আজম, নেজামে ইসলামীর ফরিদ আহমদের মতো ডাকসাইটে নেতারাও এমন ভাবে বিস্তর ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হবেন, ভাবাও যায় নি। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ একশত বাষট্টিটির মধ্যে মাত্র দুটি আসন হারায়। পিডিপি-র নুরুল আমিন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় ওই দুটি আসনে নির্বাচিত হন।

শুধু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, মোজাফফর ন্যাপের (মস্কোপন্থী হিসাবে পরিচিত) প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের কাছে হেরে যান। মোজাফফর ন্যাপকে তখন আওয়ামী লীগের 'বি টিম' বলা হতো। আগেই বলেছি, ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এই দলটি নির্বাচন করলেও ফলাফল অন্যরকম হতো না। অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকারকে (যেমন এম, আর, আখতার মুকুল) বলতে শুনি, ভাসানী নাকি শেখ মুজিবকে 'ওয়াকওভার' দেয়ার জন্য নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমার তা মনে হয় না। তখন ভাসানী ন্যাপের রাজনীতি চীনপন্থী কম্যুনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং এই কম্যুনিস্টরা তখন নীতিগত ভাবেই নির্বাচনের রাজনীতি পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবী আদায় করা সম্ভব, এই বিশ্বাস শেখ মুজিবের থাকলেও মৌলানা ভাসানীর ছিল বলে মনে হয় না।

যাই হোক, ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, আওয়ামী লীগ তখন সত্যিকার অর্থেই পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল একমাত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল আর শেখ মুজিব

লাভ করেছিলেন জনগণের অবিসম্বাদিত নেতা হওয়ার বিরল সম্মান এবং একইসাথে বিরাট দায়িত্ব। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটা আসনও পায় নি, পাওয়ার তেমন একটা প্রচেষ্টাও ছিল না। জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে একাশিটি (একশত আটত্রিশটির মধ্যে) আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে। পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায় নি। এ থেকেই বোঝা যায়, কার্যত পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনীতি তখন দুই ধারায় চলছিল এবং এর পরিণতি একটা অনিবার্য সংঘাতের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

পঞ্চম পর্ব

নির্বাচনের ফলাফল ছিল অকল্পনীয়। আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা পাবে এ নিয়ে কারও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবকটি আসনই তারা পেয়ে যাবে এমন কল্পনা আওয়ামী লীগের নেতারাও করেন নি। ভোটের ফলাফল সামরিক সরকারের হিসাব নিকাশ ওলট- পালট করে দিল। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামী লীগের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে এটা ঠিক তাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। ইয়াহিয়া সরকারের ধারনা ছিল আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন ছাড়া সরকার গঠন করতে পারবে না; আর না পারলে আওয়ামী লীগকে বশ মানানো এমন কোন কঠিন কাজ হবে না।

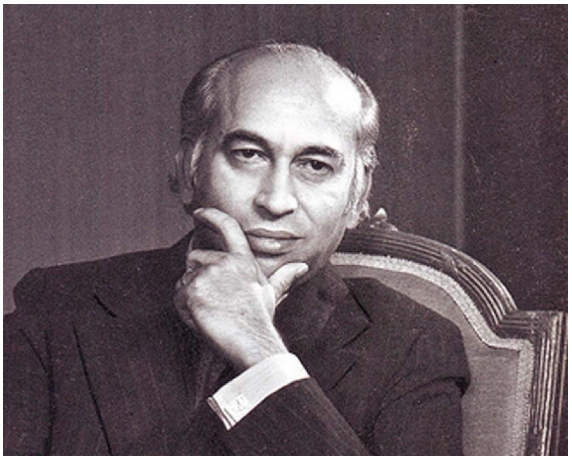

জুলফিকার আলী ভুট্টো

পশ্চিম পাকিস্তানেও নির্বাচনের ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত। আইয়ুবের পদত্যাগকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনীতিতে নবাগত ভুট্টোর নেতৃত্বে মাত্র তিন বছর আগে গঠিত পিপলস পার্টি এতগুলি আসন পেয়ে যাবে তাও ছিল অনেকেরই ধারনার বাইরে। কিন্তু যা হওয়ার তাই হলো।

আওয়ামী লীগের নেতা- কর্মী- সমর্থকরা বিজয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে রইলো কয়েকটা দিন। কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিনই। সম্বিত ফিরতে খুব একটা দেরী হলো না। সবার মনেই একধরনের অস্বস্তির ভাব। সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে, সংঘাতের দিকেই যাচ্ছে দেশটা এমনই সবার মনে হচ্ছিল।

ভুট্টো এবং শেখ মুজিবের মধ্যে পত্রপত্রিকা আর সভা- সমাবেশের মাধ্যমে বাদানুবাদ শুরু হলো। বাদানুবাদ না বলে একে হুমকি- পাল্টা- হুমকি বলাটাই ঠিক হবে। ভুট্টো নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে জাহির করতে থাকলেন। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের যতটা পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর ততটা জনপ্রিয়তা ছিল না। পাঞ্জাব আর সিন্ধুতে ভূট্টোর পার্টির প্রভাব ছিল বেশি, বেলুচিস্তান আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ভুট্টো জানতেন ইয়াহিয়া তাঁকে সমীহ করে চলতে বাধ্য থাকবেন। সরকার এবং সামরিক বাহিনীতে ভুট্টোর সাথে ঘনিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছিলেন। এটা শেখ মুজিবেরও অজানা ছিল না। ইয়াহিয়া ভুট্টোকে তাঁর চেয়ে বেশি পাত্তা দিচ্ছেন এ নিয়ে শেখ মুজিবের ক্ষোভ ছিল।

শেখ মুজিবের কথাবার্তায় হার্ডলাইনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তিনি ঘোষনা দিলেন, ছয় দফা এখন জনগণের সম্পত্তি। তাঁর উপর আওয়ামী লীগের হার্ডলাইনারদের এবং ছাত্রলীগের জঙ্গী অংশের চাপও ছিল, আগেই উল্লেখ করেছি। এরাও তাঁর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ।

বোঝা যাচ্ছিল শেখ মুজিব নিশ্চিন্ত নন যে সামরিক জান্তা সুবোধ বালকের মতো ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেবে। ভয় ছিল চক্রান্ত হবে, ষড়যন্ত্র হবে, লোভ দেখানো হবে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভাগিয়ে অন্য দলে নেওয়ার চেষ্টা হবে। (তখন ফ্লোর-ক্রসিং বা দল পরিবর্তন করলেও সদস্যপদ রাখা যেতো।)

তাই শেখ মুজিব আয়োজন করলেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের। রেসকোর্সের ময়দানে একাত্তরের জানুয়ারীর তিন তারিখ ছিল এই শপথ অনুষ্ঠানের দিন। এই অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা দিলেন ছয়দফার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হবে। এটা ছিল এক ধরণের শোডাউন। শেখ মুজিব দাবী করলেন পনেরই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের।

দেশী- বিদেশী সাংবাদিকরা শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ভিড় করতেন তার ধানমন্ডির বাসভবনে। শেখ মুজিব তখন কি ভাবছিলেন বোঝা মুস্কিল। নানামুখী চাপের মধ্যে ছিলেন সন্দেহ নেই। মানুষ যে শুধু পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ছয়দফার বাস্তবায়নের জন্যই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় নি তা নিশ্চয়ই তিনিও বুঝতে পারছিলেন। পরিস্থিতি যে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নাও থাকতে পারে হয়তো তারও আশংকা করছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবের জন্য বিব্রতকর ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইয়াহিয়া সরকারের দহরম- মহরম। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক। (মার্কিন সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগ দেয়ার পক্ষে সোহরাওয়ার্দীর ছিল অকুন্ঠ সমর্থন। মুলতঃ এ নিয়েই বিরোধ হওয়ায় ভাসানী তাঁর

নিজের গড়া দল আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে ন্যাপ গঠন করেন পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে।) বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে মার্কিন সরকারের সমর্থন যে পাওয়া যাবে না তা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন। আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমেরিকান সরকারের বোঝা উচিৎ বিশ্বের এই অঞ্চলে ভিয়েতনামের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা একমাত্র তিনিই ঠেকাতে পারেন।

একাত্তরে আওয়ামী লীগ যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারতো, কেমন হতো সেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি? আমার বিশ্বাস শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের মতো জোটনিরপেক্ষ বা সোভিয়েতঘেঁষা না হয়ে মার্কিনপন্থী হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। যদিও তাজুদ্দীনের মতো বামধারার নেতারা আওয়ামী লীগে তখন প্রভাবশালী ছিলেন, তবুও আমার মনে হয় শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ঝোঁক ছিল বিপরীতমুখী। তাঁর এই ঝোঁকটা একাত্তরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্তিমিত ছিল বলেই আমার ধারণা। একাত্তরের পরে বাংলাদেশে তাজুদ্দীন ও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমার ধারণার পেছনে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইয়াহিয়া খানের তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। ইয়াহিয়া নাকি ছয়দফা ভাল করে পড়েই দেখেন নি, নির্বাচনের পরে পড়ে দেখে নাকি তাঁর চোখ কপালে উঠেছিল। "এ তো দেখছি পুরোদস্তুর স্বাধীনতার দাবী"। শেখ মুজিব নাকি তাকে নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, ছয়দফা নিয়ে অহেতুক চিন্তিত না হতে – "ছয়দফা আল্লার বাণী নয়, মানুষের লেখা দলিল", তাঁর ভাষ্যানুযায়ী এইধরণের কথাই নাকি শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন।

হয়তো বলেছিলেন। ইয়াহিয়ার কথা সত্যি না মিথ্যা তা ইয়াহিয়াই জানেন, তবে একজন অকর্মণ্য, মদ্যপ এবং ওম্যানাইজার হিসাবে তার কুখ্যাতি ছিল। ছয়দফা ভাল করে পড়ে না দেখার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তিনি যে একজন অপদার্থ এবং অপরিণামদর্শী প্রশাসক ছিলেন তারই প্রমাণ দিলেন।

মার্চে কি এপ্রিলে আমাদের এইচ, এস, সি পরীক্ষা হওয়ার কথা, কিন্তু আমার পড়াশোনায় মন নেই। কেন যেন মনে হচ্ছিল পরীক্ষা হওয়ার মতো পরিবেশ দেশে থাকবে না। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আমি আরো বেশি করে জড়িত হয়ে পড়ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন দলের (বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন) কার্যালয়ে যেতাম। তখন আমি কলেজের চত্ত্বর ছাড়িয়ে দলের শহর শাখায় (চট্টগ্রাম) সক্রিয়ভাবে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি।

নির্বাচনে অংশ না নিলেও নির্বাচন- পরবর্তী সময়ে বামপন্থীরা বসে ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল যে দেশকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, বরং আরো গভীর

সংকটের দিকে ঠেলে দেবে, তা তারা সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় যে শুধু আওয়ামী লীগ ও ছয়দফার প্রতি জনগণের সমর্থন নয় বরং সমাজতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি জনগণের রায় এই বোধটা বামপন্থীদের জন্য গৌরবের কারণ ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনা, গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী, আর অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একইসাথে এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বামপন্থীদের তাই লক্ষ্য ছিল এই অর্জনকে ধরে রাখার এবং আওয়ামী লীগের উপরে যে সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী শ্রেণীটির প্রভাব ছিল তা থেকে দলটিকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা।

মৌলানা ভাসানী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে সতর্ক করে বলেছিলেন, বাংলার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম শুভ হবে না। সাথে সাথে এও বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবই হচ্ছেন জনগণের নির্বাচিত নেতা এবং মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি তার আস্থা রয়েছে।

একাত্তরের বিশে জানুয়ারী আসাদ দিবসে আমাদের ছাত্র সংগঠন (পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন) দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলো। আওয়ামী লীগের নেতারা বিরক্ত হলেও উচ্চবাচ্য করেন নি। আমাদের দলের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতার এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে সামনে নিয়ে আসা। হরতালের প্রস্তুতিকালীন সময়ে, খুব সম্ভবতঃ জানুয়ারীর পনের কিংবা ষোল তারিখের এক প্রচার মিছিল ও পথসভায় আমিও অংশ নিয়েছিলাম। এই কর্মসূচীতে আমরা ছিলাম মাত্র দশ-বারো জন। চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লায় জনাকীর্ণ সিরাজুদ্দৌলা রোড ধরে সন্ধ্যার কিছুটা পরে আমরা শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে চারপাঁচ জন পুলিশের একটা দল ট্রাক থেকে নেমে আমাদের ঘিরে ধরে। আমরা অবস্থা বেগতিক দেখে যে যেদিকে পারি ছুটে পালিয়ে গেলাম। শুধুমাত্র শহিদুল্লা ধরা পড়েছিল। শহিদুল্লা চট্টগ্রাম কলেজে আমার একবছরের সিনিয়র ছিল। হরতালের কিছুদিন পরে শহিদুল্লা ছাড়া পায়।

হরতালের আগের রাতে সারারাত জেগে রাস্তায় রাস্তায় ব্যরিকেড দেওয়া এবং হরতালের দিনও পিকেটিং ইত্যাদি নিয়ে আমরা বেশ ব্যস্ত ছিলাম। পুলিশের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক, কিন্তু কেন জানিনা তাদের আচরণ ছিল সংযত। তারা তেমন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নি। হরতাল সারা পূর্ব বাংলায় সাফল্যের সাথে পালিত হয়েছিল। নিজেদের সাফল্যে আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। সাথে আনন্দ-উত্তেজনা তো ছিলই। আমার যতটুকু মনে পড়ে শুধুমাত্র একটা ছাত্র সংগঠনের একক আহবানে দেশব্যাপী হরতাল পালন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে ছিল সেই প্রথম। বলা দরকার, আমাদের মুল দলের নামে হরতালের ডাক দেয়া তখন সম্ভব ছিল না। হরতাল সফল হওয়ার পেছনে কারণ ছিল স্বাধীনতা ও

সমাজতন্ত্রের দাবীর জনপ্রিয়তা আর শহীদ আসাদুজ্জামানের জন্য সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আবেগানুভুতি।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসলেন শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে। কি কথা হয়েছিল তাদের মধ্যে তখন? জানা সম্ভব ছিল না। কেননা এসব আলোচনা হতো রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবং অংশগ্রহনকারীদের কেউই এসব নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতেন না। সাংবাদিকদের সাথে কথা বললেও দায়সারা গোছের জবাব দিতেন। তবে পরবর্তীতে প্রকাশিত অনেকেরই লেখা এবং কথাবার্তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের আগেই পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষ করে ভুট্টোর সাথে সমঝোতায় আসতে বলেন। আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল, সব আলোচনা- সমঝোতা হবে জাতীয় পরিষদেই। এমন কি ছয়দফা নিয়েও আপোষরফা হতে পারে, কিন্তু তা হতে হবে জাতীয় পরিষদে। কিন্তু তবুও ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে রাজী করালেন ভুট্টোর সাথে কথা বলতে।

আওয়ামী লীগের কৌশল ছিল ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করা। আর এই কৌশলের অংশ হিসাবে শেখ মুজিব তাঁদের মধ্যকার একান্ত আলোচনার সময়ে ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন [১]। খুব সম্ভবতঃ ইয়াহিয়া সেই প্রস্তাব সাথে সাথেই গ্রহণ করেন নি কিংবা প্রত্যাখানও করেন নি, 'পরে দেখা যাবে' গোছের উত্তর দিয়ে আলোচনা শেষ করেছিলেন। তবে মুজিবের সাথে আলোচনার ফলাফলকে সন্তোষজনক ভেবে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের বললেন, "শেখ মুজিব দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী"।

কিন্তু দুদিন পরেই ভুট্টোর লারকানার জমিদার বাড়ীতে গেলেন ইয়াহিয়া পাখী শিকারের দাওয়াত রক্ষা করতে। শেখ মুজিব মনক্ষুন্ন হলেন। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর মধ্যকার ব্যাক্তিগত সম্পর্ক যে তাঁর আর ইয়াহিয়ার সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ট এই বোধোদয় মুজিবের জন্য সুখকর ছিল না। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টির কৌশল হয়তো কার্যকরী হবে না। ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথাই শুনবেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া ভুট্টোকেও রাজী করালেন ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে। জানুয়ারীর শেষের দিকে দলবল নিয়ে ভুট্টো ঢাকা আসলেন। এসেই শেখ মুজিবের সাথে দেনদরবার শুরু করলেন। কিন্তু ছয়দফার ব্যাপারে তারা খুব একটা কথাবার্তা বললেন না। ভুট্টোর উৎসাহ ছিল ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলায়। ভূট্টো সরকারে অংশীদারিত্ব চেয়েছিলেন। বিরোধীদলের আসনে বসার আগ্রহ ভুট্টোর ছিল না।

তিনি নিজের জন্য উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন নিজের দলের জন্য চারটি মন্ত্রীপদ। আওয়ামী লীগ রাজী হয় নি। ভুট্টো শেষে নাকি প্রেসিডেন্টের পদ চেয়েছিলেন। নাম উল্লেখ না করে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "ওটা একজনকে দেয়া হয়ে গেছে"।

আওয়ামী লীগ আর পিপলস পার্টির মধ্যে এই আলোচনা নিয়ে পরে একেকজন একেক রকম কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন আলোচনা সন্তোষজনকভাবেই শেষ হয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন দুইপক্ষই একে অপরের উদ্দেশ্য নিয়ে আরো বেশি সন্দিহান হয়ে, একে অপরের উপর আরো বেশি অবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা শেষ করেছিলেন।

অবশেষে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করলেন। অধিবেশন বসবে ঢাকায় মার্চের তিন তারিখে।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দুই সপ্তাহ ঢাকা ছিল রাজনৈতিক নাটকের রঙ্গমঞ্চ। একদিকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যস্ত, অন্যদিকে তরুণ ছাত্রকর্মীরা স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার। 'জয় বাংলা বাহিনী' নামে একটা সংগঠন পনেরই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে 'গার্ড অব অনার' দেয়। এই অনুষ্ঠানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রভাবশালী একটা অংশ তখনই (ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে) স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। পরে মার্চের দুই তারিখে (জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর ছাত্রলীগ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই পতাকাকে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হিসাবে ঘোষণা দেয়।) আজকের পতাকার লাল বৃত্তের মাঝখানে তখন বাংলাদেশের মানচিত্র সোনালী রং- এ আঁকা থাকতো।

বাংলাদেশের পতাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭১

ওদিকে ভুট্টোও বসে ছিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার কাজে তিনি এইসময়ে খুবই সক্রিয় ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। সামরিক বাহিনীর অন্যান্য প্রভাবশালী অফিসারদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। তাঁর দলের সদস্যদের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র নিয়ে রাখলেন। অন্যান্য দলের সদস্যদের হুমকি দিলেন, ঢাকায় গেলে পা ভেঙ্গে দেয়া হবে বলে।

ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে ডেকে পাঠালেন। বার বার তাগাদা দেয়া সত্বেও মুজিব গেলেন না, ইয়াহিয়া খুবই নাখোশ হলেন। ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভূট্টোর সাথে সমঝোতায় আসার জন্য মুজিবের উপর চাপ সৃষ্টি করা। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য।

ভুট্টোর চাপে শেষ মুহূর্তে ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। মার্চের এক তারিখে ঘোষণা দিলেন তিন তারিখের অধিবেশন স্থগিত করা হলো আনির্দিষ্ট কালের জন্য। পূর্ব বাংলা ফেটে পড়লো বিক্ষোভে। ফুঁসে উঠলো জনগণ। সেদিন থেকেই মানুষ কার্যত বাংলাদেশকে স্বাধীন হিসাবে ভাবতে শুরু করলো। সেদিনই যেন সবাই একযোগে সিদ্ধান্ত নিল - আর নয়, পাকিস্তান আর নয়। শেখ মুজিবের মুখ থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটাই শুধু শোনার অপেক্ষা।

তথ্যসূত্র – পঞ্চম পর্ব

[১] Sisson and Rose, *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, 1990.

টীকা - এই জাতীয় লেখার বেশির ভাগই স্মৃতিচারণমূলক। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার চাইতে নিজের মত এবং পছন্দের রাজনৈতিক অবস্থানের পক্ষে সাফাই গাওয়ার একটা প্রবণতা এসব লেখায় দেখা যায়। যারা লিখেছেন তারা তখনকার ঘটনাবলীর সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকের লেখায় আবার গুরুত্বপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্বভাবতই এদের লেখা এবং যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের বক্তব্য পুরোপুরি না হলেও অংশতঃ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। তাই এই লেখাগুলো থেকে পাওয়া তথ্য এবং তথ্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে পাঠকদেরই, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে, সতর্কতার সাথে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে একাডেমিক গবেষণা এবং লেখালেখি প্রায় হয় নি বললেই চলে। তবে ব্যতিক্রম আছে। এদের মধ্যে একটা হচ্ছে *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh*, by Richard Sisson and Leo E. Rose। আমি আমার এই লেখায় এই বইটা থেকে অনেক তথ্য নির্ভরযোগ্য মনে হওয়ায় ব্যবহার করেছি। তবে শুধু তথ্যই, মতামত এবং বিশ্লেষন আমার নিজস্ব।

ষষ্ঠ পর্ব

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণার পর মার্চের এক তারিখ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের নির্দেশে এবং তাজউদ্দীনের ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনের নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং ন্যুন্যতম কাজকর্ম ছাড়া সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। শেখ মুজিব গান্ধীর মতো করে অহিংস- অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। মার্চের তিন তারিখে পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল।

শাসক গোষ্ঠীর মধ্যেও সংকট ঘনীভুত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। ইয়াহিয়া খানের সাথে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা নিয়ে মতদ্বৈততার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিন তারিখেই অধিবেশনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়, মার্চের পঁচিশ তারিখে। এক তারিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে আবার তিন তারিখেই নতুন তারিখের ঘোষণা থেকেই বোঝা যায় ইয়াহিয়া সরকারের সিদ্ধান্তগুলি সুবিবেচনাপ্রসুত ছিল না। একই সাথে ঢাকায় সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করেন ইয়াহিয়া খান মার্চের দশ তারিখে। ভুট্টোর পিপলস পার্টি ছাড়া আর কোন দল এই বৈঠকের ডাকে সাড়া দেয় নি।

অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণার এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে, শাসকগোষ্ঠী তা ধারণা করে নি। তাই 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের' জন্য তড়িঘড়ি কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়, যেমন উপরে উল্লেখিত ঘোষণাগুলি। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে হার্ডলাইনে যাওয়ার প্রবনতাও দেখা যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, জয়দেবপুরে বিক্ষোভরত সাধারণ মানুষের ওপর সেনাবাহিনী গুলি চালায়, মারা যায় অনেকেই। শেখ মুজিব নবঘোষিত তারিখে পরিষদের অধিবেশনে বসতে অসম্মতি জানান। সর্বদলীয় বৈঠকও বর্জনের ঘোষণা দেন। যা বলবার রেসকোর্সে সাত তারিখের জনসভায় বলবেন, জানিয়ে দেন।

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে প্রস্তুত? সাত তারিখের ভাষনে শেখ মুজিব কি বলবেন শোনার জন্য শুধু দেশবাসী নয়, সরকারও অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে শেখ মুজিবের পক্ষে আর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে থাকা সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় তাকে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধের নেতা সেজে সম্পুর্ণ ভিন্ন

ধরণের এক রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে হয়। এই ধরণের রাজনৈতিক জীবনের জন্য শেখ মুজিব নিজেকে কখনো প্রস্তুত করেন নি, বা করার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করেন নি। আমার মনে হয় তিনি আসলে এই ধরনের রাজনীতির (বিপ্লবী, অনিয়মতান্ত্রিক), যা বামপন্থীদের ট্রেডমার্ক ছিল, বিরোধী ছিলেন নীতিগতভাবে। আর আত্মগোপনে যাওয়া মানেই ভারতে আশ্রয় নেয়া, এই বাস্তবতাকেও মেনে নিতে হয়। শেখ মুজিব কি জানতেন এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তিনি কি করবেন? খুব সম্ভবত জানতেন না, সময় আসলে অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন হয়তো এরকমই ভেবেছিলেন।

তাই সশস্ত্র যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে কি করা হবে, যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কি হবে, এসব প্রশ্ন নিয়ে আওয়ামী লীগের কোন চিন্তাভাবনা ছিল কিনা, কোন প্রস্তুতি বা কোন 'কন্টিনজেন্সি প্ল্যান' ছিল কিনা জানা যায় না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় ছিল না। এই ব্যাপারটা আমাকে একটু অবাক করে। কেন যেন মনে হয় এই সময়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল একটু বেশি 'রিএক্টিভ', পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার বা রাখার কোন পরিকল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায় না তখনকার আওয়ামী লীগের কর্মকান্ডে।

তাই পঁচিশে মার্চের রাতে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব যা করেছিলেন - গ্রেফতার বরণ, তা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফল ছিল, না কি সিদ্ধান্তহীনতার পরিণতি ছিল, সন্দেহাতীত ভাবে জানা যায় না। খুব সম্ভবত তিনি হিসাব করে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে শোনা যায়, শেখ মুজিব যে গ্রেফতার হওয়ার অপেক্ষায় বাড়িতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে গ্রেফতার হয়েছেন এটা নাকি আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও জানতেন না। এ নিয়ে আজো নানাজনে নানা কথা বলেন, যখন বলেন তখন নিজ নিজ অবস্থান থেকে মনের মাধুরী মেশান, রং চড়ান, যে সব ঘটনা ঘটে নি সেগুলো ঘটেছে বলে প্রচার করেন, যে গুলো ঘটেছে তার কিছু কিছু ঘটে নি এমন দাবী করেন। কিন্তু আসলে কি হয়েছিল তা জানা যায় না। শেখ মুজিব নিজেও এ নিয়ে কিছু বলেন নি, হয়তো সঙ্গত কারণেই।

শেখ মুজিব যে আগেপরে গ্রেফতার হবেন তা তিনি জানতেন। হয়তো চাইতেনও। এভাবেই আন্তর্জাতিকভাবে এই সঙ্কটের সমাধান হবে তাই তিনি ধারনা করেছিলেন, এবং আশাও। শেখ হাসিনার স্বামী ওয়াজেদ আলী মিয়ার স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে জানা যায়, সাতই মার্চ রাতে, সেই ঐতিহাসিক ভাষনের পরে, খেতে বসে তিনি পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন, তিনি যে কোনদিন গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন তাই তাঁরা যেন তাঁর সাথে খেতে বসেন রোজ এই কটা দিন। নিজের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে শেখ মুজিবের ধারণা ছিল বাস্তবোচিত।

বাংলার মানুষের স্বাধিকার আদায়ের প্রশ্নে শেখ মুজিবের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু তিনি তা আদায় করতে চেয়েছিলেন বিনা রক্তপাতে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। বিনা রক্তপাতে যে জিততে পারে সেই সেরা সেনাপতি – বলেছিলেন তিনি।

মার্চের একতারিখের আগে তাঁর মনে ক্ষীণ হলেও হয়তো এই আশা ছিল যে, তিনি সারা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ছয়দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আদায় সম্ভব এটাই তখন তিনি ভেবেছিলেন। এই ভাবনার মধ্যে দোষের কিছু আমি দেখি না। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আইনসম্মতভাবে আওয়ামী লীগ যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহলে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা 'স্বাধীন' হওয়ার প্রয়োজন তো ছিলই না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলার মানুষের অধিকার কায়েম করতে পারবেন এই বোধ এবং বিশ্বাস থেকে শেখ মুজিব যদি তাঁর কর্মপদ্ধতি এবং পদক্ষেপগুলি ঠিক করে নেন তাতে দোষের কি আছে? এই বিশ্বাসের জন্য শেখ মুজিবের বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর সততা বা সাহস নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু মানুষ ঠিকই বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তা হতে দেবে না - বাঙালিদের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসতে দেবে না। একাত্তরের পূর্ব বাংলায় জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান ছিল অনেক উন্নত। তারা তখন মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত। শেখ মুজিবের রাশ-টানা নেতৃত্বের চেয়ে ছাত্রদের স্বতস্ফুর্ত জঙ্গী কর্মসূচীতে মানুষ সায় দিয়েছিল বেশি। স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে শেখ মুজিব জনগণের আস্থাই শুধু হারাবেন না, তাঁর নিজের দলেও শৃংখলা বজায় রাখতে পারবেন না, এমন সম্ভাবনা দেখা দিল। শেখ মুজিবও বুঝতে পারছিলেন মানুষের মনোভাব। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষনা দিতে তিনি তখনো প্রস্তুত নন, সাহসী হলেও মুজিব ছিলেন হিসেবী রাজনীতিক।

মার্চের ছয় তারিখ রাতে শেখ মুজিব নাকি তাঁকে গ্রেফতার করার অনুরোধ নিয়ে দুইজন বিশ্বস্ত অনুসারীকে পাঠিয়েছিলেন ঢাকার জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার কাছে। হাসান জহীরের [১] ভাষ্যমতে মুজিব বলে পাঠিয়েছিলেন, দলের চরমপন্থীদের চাপের মুখে পরদিনের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষনা দেয়া ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। মেজর জেনারেল রাজার ধারণা হয়েছিল শেখ মুজিব সামরিক সরকারের 'মুড' বোঝার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এই ধরণের বক্তব্য নিয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজা মুজিবের অনুরোধ রাখেন নি, তাঁকে গ্রেফতার করেন নি। বলেছিলেন, তিনি মনে করেন না মুজিব অসহায়। আর নাকি সাবধান করে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতার ঘোষনা দিলে তিনি কামান-ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এবং মুজিবের আর তাঁর

অনুসারীদের পূর্ব পাকিস্তান শাসন করার শখ চিরতরে মিটিয়ে দেবেন। ঘটনাটা আসলেই ঘটেছিল নাকি এটি একজন পাকিস্তানী জেনারেলের বানিয়ে বলা মিথ্যেকথা অথবা একজন পাকিস্তানী লেখকের চাতুর্যপূর্ণ প্রচারণামূলক লেখার নিদর্শন বলা মুস্কিল। তবুও তখনকার পরিস্থিতিকে বুঝতে সহায়তা করবে ভেবে ঘটনাটার উল্লেখ করলাম।

সাতই মার্চের বক্তৃতা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। রাজনীতিতে পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সময়োপযোগী ভারসাম্য রক্ষার একটা সফল দৃষ্টান্ত। যদিও এই ভারসাম্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তবুও পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত এই ভারসাম্য টিকে ছিল বলা যায়। শেখ মুজিবের এই ভাষন উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। কোন স্ক্রিপ্ট বা টেলিপ্রম্পটার না দেখে এই ধরনের বক্তৃতা দেয়া জনমানুষের সাথে সম্পর্কহীন কোন নেতার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সেদিন চট্টগ্রামে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি রেডিওর সামনে বক্তৃতাটা শোনার জন্য। আগেই ঘোষনা দেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবের ভাষন রেসকোর্স থেকে সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রেডিও পুরোপূরি নিশ্চুপ, কোন ঘোষনা ছাড়াই রেডিওর অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। পরে জানা গেল সরকারের নিষেধাজ্ঞার ফলে ভাষন প্রচার করা যায় নি। প্রতিবাদে রেডিওর বাঙালি কর্মচারীরা স্টেশন বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। পরদিন সকালে ভাষনটা রেডিওতে প্রচার করা হয়।

সাতই মার্চ ১৯৭১

সাতই মার্চের বক্তৃতায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারতেন না। তাই দেন নি। কিন্তু তাৎক্ষণিক রক্তপাত এড়াতে যা বলার প্রয়োজন ছিল তা বলেছিলেন। অন্যদিকে ছাত্রজনতার ক্ষোভও প্রশমিত করতে পেরেছিলেন। মানুষের মনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগাতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন মুক্তির আকাংখায় মানুষকে উজ্জীবিত করতে। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনগণকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এই বক্তৃতায় শেখ মুজিবের ভুমিকা অভিযোগকারীর, শুরু করেছেন এই বলে, "ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন"।

অনুযোগ করেন, "কি অন্যায় করেছিলাম?" তারপরে বর্ণণা করেন ইতিহাস। দুঃখের ইতিহাস, "তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস"।

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই," এই কথাটা। এই কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এই উপলদ্ধি যে, প্রধানমন্ত্রীত্ব আর স্বাধিকার একসাথে পাওয়া যাবে না।

প্রথমে তাঁর হাতদুটি ছিল পেছনে, যখন তিনি অভিযোগকারীর মতো করে অন্যায়-অবিচারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। মাঝামাঝি জায়গায় এসে তাঁর কন্ঠে প্রতিবাদের স্বর, প্রতিরোধের প্রত্যয়। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে বললেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি উত্তেজিত, যদিও সংযত। অত্যন্ত আবেগময় উচ্চারণে তর্জনী উঁচিয়ে ঘোষনা দিলেন,

"আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের ওপর হত্যা করা হয় – তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু – আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো"।

বাংলার মাটিতে শত্রুর সাথে যুদ্ধ হতে পারে, শেখ মুজিব তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে মনে হয়, যুদ্ধের প্রকৃতিটা কেমন হবে তা তিনি আঁচ করতে পারেন নি। তখন কেউ কি পেরেছিল?

কিন্তু তবুও বলতে হয়, যুদ্ধ যেন না হয় এটাই তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন। আশা করেছিলেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে সঙ্কটের সমাধান হবে। তাই পরক্ষণেই বললেন, "তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না"।

ঘোষিত পঁচিশ তারিখের অধিবেশনে যাবেন না বললেন, কিন্তু আলোচনায় বসার পথ খোলা রাখলেন। চারটি শর্ত দিলেন এবং বললেন, এগুলো মেনে নিলে অধিবেশনে যাবেন কিনা ভেবে দেখবেন। শর্ত চারটি হলো, সামরিক আইন তুলে নিতে হবে, সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। রাজনীতির নুন্যতম জ্ঞান যারা রাখেন তারা বুঝবেন এই শর্তগুলো সামরিক সরকারের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না। বস্তুত শেষ শর্তটা মেনে নিলে প্রথম তিনটা শর্তের আর কোন দরকারই থাকে না। তবে শর্তগুলো যৌক্তিক ছিল কি না এই প্রশ্ন সেদিন বাঙালিদের মধ্যে কেউই তোলেন নি। যৌক্তিকতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল শর্তগুলোর প্রভাব তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। এগুলো ছিল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল আর জনগণের অসন্তোষ অবদমনের প্রচেষ্টা। এই কৌশল ও প্রচেষ্টা সাতই মার্চের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সফল হয়েছিল বলা যায়।

সাতই মার্চের ভাষনের শেষে তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ঘোষণা দিলেন না, কিন্তু শ্লোগান দিলেন। অনেকের কাছে এটাই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। তবে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ছাত্র- জনতার জঙ্গী মনোভাব প্রশমনে এই শ্লোগানের বিরাট ভুমিকা ছিল। 'মুক্তি' আর 'স্বাধীনতা' শব্দদুটি রূপকার্থে ব্যাবহার করা হয়েছে, বিচ্ছিন্নতা অর্থে নয়, এই ব্যাখ্যা পরে আলোচনার সময় সামরিক সরকারকে দেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামাল দিতে এমন শ্লোগান না দিয়ে উপায় ছিল না, এও নাকি শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন।

একেই বোধহয় বলে বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্কট। শেখ মুজিব ব্যাক্তিগতভাবে সেদিন এই সঙ্কটের মোকাবিলা করেছিলেন একজন বুর্জোয়া রাজনীতিক হিসেবে সার্থকতার সাথে। পরিচয় দিয়েছলেন অসম সাহসিকতার। মানুষের আস্থা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, মানুষ বিশ্বাস করেছিল শেখ মুজিব জীবন দেবেন তবুও বাংলার মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নে আপোষ করবেন না।

কিন্তু অবশেষে দেশবাসী কি সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিল? পঁচিশে মার্চের রাতে নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত ঢাকাবাসীদের, রিক্সাচালনারত অবস্থায় চালক আর ঘরমুখী যাত্রীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে অবস্থানরত ছাত্রদের, ক্যাম্পাসে বসবাসকারী

অধ্যাপকদের, বস্তির মানুষদের এমন কুকুর-বিড়ালের মতো কেন মরতে হলো সেই রাতে? কেউ কি জানতেন না কি ঘটতে যাচ্ছে? কেন জানতেন না?

এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো কোনদিনও পাওয়া যাবে না। আজ চল্লিশ বছর পরেও অজানা রয়ে গেছে অনেক কিছুই। তবুও হয়তো কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যদি সাতই মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ, এই আঠার দিনে দেশে, বিশেষ করে ঢাকায়, ঘটা ঘটনাগুলো আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করি।

তথ্যসূত্র – ষষ্ঠ পর্ব

[১] Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Oxford University Press, 1994, p. 488.

সপ্তম পর্ব

মার্চের নয় তারিখে পল্টনে জনসভা করেন মওলানা ভাসানী। তিনি পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। ভাসানী শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে বাংলার সংগ্রামী বীর হওয়ার আহবান জানান। মনে রাখা দরকার, সেই দিনটি ছিল নয়'ই মার্চ, সাত'ই মার্চের পরে মাঝখানে মাত্র একটা দিন গেছে। কিন্তু সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে এরি মধ্যে।

মৌলানা ভাসানী কেন শেখ মুজিবকে এই ধরনের আহবান জানিয়েছিলেন তার পেছনে ঐতিহাসিক কারণ আছে। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীর গুরুত্ব লাঘবের চেষ্টা চালান। তখন তিনি বলেছিলেন, আটানব্বই পার্সেন্ট স্বায়ত্বশাসন তো দেয়া হয়েই গেছে, বাকী দুই পার্সেন্ট কোন ব্যাপার না।

ভাসানীর আহবান অনুযায়ী অবশেষে শেখ মুজিব বাংলার সংগ্রামী বীর হয়েছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত তাঁর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হওয়ার আকাঙ্খা একেবারেই ছিলনা একথা বলা যাবেনা। আমি আগেই বলেছি, শেখ মুজিবের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে এতে দোষের কিছুই আমি খুঁজে পাই না। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলার সংগ্রামী বীর দুটোই একইসাথে হওয়া সম্ভব।

আমার বিশ্লেষণে শেখ মুজিবের তখনকার রাজনৈতিক কৌশল তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বাংলার মানুষকে সঙ্কট থেকে রেহাই দেয় নি। শেখ মুজিব সেদিন পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমন থেকে বাঁচাতে পারেন নি। শেখ মুজিবের এই ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁর নিয়মতান্ত্রিক "বুর্জোয়া" [১] রাজনীতি।

গান্ধী- স্টাইলের এই অহিংস- অসহযোগ টাইপের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি স্বাভাবিক সময়ে পারলেও, সঙ্কটকালে খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। আমার পর্যবেক্ষণে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ভারত উপমহাদেশের তিনভাগে ভাগ হওয়াই প্রমাণ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে যতই অহিংসার লেবেল লাগানো থাকুক, সাধারণ জনগণ কখনোই হিংসার হাত থেকে রেহাই পায় না। সাতচল্লিশে পায় নি ভারত- পাকিস্তানে, বাংলাদেশেও পায় নি একাত্তরে।

ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করার কৃতিত্ব আমি শুধু গান্ধী এবং তাঁর রাজনীতিকেই দিতে রাজী নই। সূর্য সেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরামেরা বৃথাই জীবন দিয়েছেন আমি মানতে পারি না। ভিন্ন ধারার রাজনীতিক ছিলেন, তাই বলে সুভাষ বসুর অবদান কি অস্বীকার করা যায়?

শেখ মুজিবের সীমাবদ্ধতা সত্বেও, আসলে বলা উচিত সীমাবদ্ধতার কারণেই, যা করার ছিল তাই তিনি করেছিলেন। বরং আমি বলবো, তিনি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন সামরিক জান্তার মুখোমুখি হয়ে। তাই এই সঙ্কটকে আমি বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্কটই বলবো।

তবে শুধু ব্যাক্তিত্ব আর সাহস দিয়ে সেদিন বুর্জোয়া রাজনীতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না শেখ মুজিবের পক্ষে। শুধু শেখ মুজিব আর তাঁর আওয়ামী লীগই নয়, এমন কি বামপন্থীরাও সেদিন তাঁদের বুর্জোয়া-প্রভাবিত রাজনীতির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। বামপন্থীদের হিমালয়সম ব্যার্থতার ইতিহাস না লিখলে এই আলোচনা কিছুতেই সম্পূর্ণতা পাবে না।

মস্কোপন্থী নামে পরিচিত বামপন্থীরাও আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর মতোই কুচকাওয়াজ ইত্যাদি করে যাচ্ছিল। পার্থক্য শুধু এরা 'জয় বাংলা' শ্লোগানটা উচ্চারণ করতো না। কারণ 'জয় বাংলা' জাতীয়তাবাদী শ্লোগানই শুধু নয়, ছিল আওয়ামী লীগের দলীয় শ্লোগান। আর পিকিংপন্থীরা ছিল নানা দল-উপদলে বিভক্ত। তবে এদেরই দু-একটা সংগঠন গোপনে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। যদিও যুদ্ধটা কি ভাবে হবে, অস্ত্র কোত্থেকে আসবে, কে এ যুদ্ধে শত্রু, আর কেই বা মিত্র এ নিয়ে তাদের খুব একটা পরিস্কার ধারনা ছিল না। আগেই উল্লেখ করেছি, সঙ্কট শুধু বুর্জোয়া রাজনীতিরই ছিল না, ছিল বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতিরও। আসলে এরা পড়েছিল আরো বড় সঙ্কটে।

আমি যে দলটির সাথে যুক্ত ছিলাম সেই বামপন্থী কম্যুনিস্ট সংগঠনটিও, আজ বুঝতে পারি, বুর্জোয়া রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ছিল না। যদিও বিপ্লবী পরিস্থিতি, যা তখন দেশে বিরাজ করছিল, বিপ্লবীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগের সৃষ্টি করে। সেই সুযোগ ছিল সেদিনের পূর্ব বাংলায়। কিন্তু ছিল না সত্যিকারের বিপ্লবী সংগঠন ও প্রস্তুতি। এতগুলো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য বিপ্লবী বামপন্থীরা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেন কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য তাদেরও যে কোন পরিকল্পনা ছিল না এই সত্যটা সযতনে এড়িয়ে যান। জাফর-মেনন-রনোরা পঁচিশে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে দেশের মাটিতে শেষ জনসভা করেন পল্টন ময়দানে, এ নিয়ে

গর্বও করেন, কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, তাঁরাও বোঝেন নি জনসভা করার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।

বামপন্থীদের সমস্যার মূল কারণ ছিল আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ওপরে অতিমাত্রায় নির্ভরতা। সোভিয়েত রাশিয়া ও গণচীন এই দুই পরাশক্তি আর পশ্চিম বাংলার নক্সাল আন্দোলনের প্রভাবে তখন পূর্ব বাংলার বামপন্থীদের দিশাহারা অবস্থা।

মস্কোপন্থীদের সমস্যা ছিল কম, এবং তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ। তাদের নিজেদের মধ্যে দল-উপদল খুব একটা ছিল না। এরা আগে থেকেই আওয়ামী লীগের বি- টিম হিসেবে পরিচিত ছিল। আন্তর্জাতিক ভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ভারতের সখ্যতা ছিল, আর পাকিস্তানের সাথে ছিল আমেরিকার দহরম- মহরম। তাই সংঘাতটা যেহেতু পাকিস্তানের সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের, মস্কোপন্থীরা ছিল তুলনামূলক বিচারে সুবিধাজনক অবস্থানে। আওয়ামী লীগ আগে পরে ভারত- সোভিয়েত অক্ষের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে এটা নিশ্চয়ই তাদের হিসাবে ছিল। তাই শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে জাতীয়তাবাদী এবং যতটা পারা যায় সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভুতিশীল রাখাটাই ছিল এদের কৌশল। এই কৌশল কিছুটা হলেও সফল হয়েছিল বলা যায়। (যুদ্ধের পরেও পঁচাত্তরে বাকশালের পতন হওয়া পর্যন্ত তারা এই কৌশল বজায় রাখে।) যদিও নামে কম্যুনিস্ট, কার্যত এরা বুর্জোয়া রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিই করে যাচ্ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির ওপর এদের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার জন্য তখন বলা হতো মস্কোয় বৃষ্টি পড়লে এদের নেতারা ঢাকায় মাথার ওপরে ছাতা ধরেন।

গণচীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল না, সেই বাষট্টির যুদ্ধ থেকে। তখন থেকেই পাকিস্তানের সাথে চীন বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করে নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে, 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' এই নীতি অনুযায়ী। পূর্ব পাকিস্তানের চীনপন্থী কম্যুনিস্টরা তখন ভাসানীর নেতৃত্বে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইউব' নীতি অনুসারে নিজেদের কর্মসূচী প্রনয়ণ করে। এটা নীতি ছিল না কৌশল ছিল তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে এটা যে একটা ভুল পদক্ষেপ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাসানী কিছুদিনের মধ্যেই এই অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং আইয়ুব খান- ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নার পক্ষে কোয়ালিশনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা হিসেবে অংশ নেন। এই কোয়ালিয়শনে আওয়ামী লীগও ছিল।

কিন্তু কম্যুনিস্টদের বিভ্রান্তি মনে হয় অত সহজে এবং অত তাড়াতাড়ি কাটে নি। এই ধরণের বিভ্রান্তি, যার মূলে ছিল গণচীনের প্রতি মোহ, তাদেরকে আরো বড় ভুলের দিকে নিয়ে যায়। তখন থেকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে পূর্ব বাংলার জনগণের দ্বন্দকে প্রধান দ্বন্দ মনে না করে ধনিক শ্রেণীর সাথে শ্রমিক- কৃষক শ্রেণীর দ্বন্দকে প্রধান

দ্বন্দ মনে করতে শুরু করেন। প্রায় একই সময়ে ঘটা নক্সালবাড়ী আন্দোলন এদের মধ্যে 'নাচুনি বুড়ির ওপর ঢোলের বাড়ির' মতো প্রভাব ফেলে। প্রায় সবকটি চীনপন্থী দল (তখন কমপক্ষে চারটির অস্তিত্ব ছিল) নক্সালবাড়ীর পথ ধরে শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন নেয়। এদের মধ্যে দু'একটা দল আবার একই সাথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাও বলতে থাকে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার ডাক দিতে থাকে ।

নক্সাল আন্দোলনের সংগঠক চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দলের (ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি – এম এল) একটা শ্লোগান ছিল, 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদেরও চেয়ারম্যান'। এ থেকেই বোঝা যায় আন্তর্জাতিকতার নামে এরা হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল। চীন সরকারও রেডিও পিকিং- এর মাধ্যমে এদের পিঠ চাপড়াতো। তবে চীন ভারতকে বিব্রত করার জন্যই এদেরকে উস্কানি দিত, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট রাজনীতির সাথে এর মনে হয় না কোন সম্পর্ক ছিল। নক্সালদের সীমাহীন আত্মত্যাগ আর অসাধারণ বীরত্ব সত্বেও চারু মজুমদার আর কানু সান্যালের নেতৃত্বে এদের রাজনীতি ব্যাক্তি- পূজা আর 'কাল্ট'- প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তখনকার পূর্ব বাংলায় নক্সাল রাজনীতির অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী আর সশস্ত্র ছিল সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন 'মাও'স থট রিসার্চ সেন্টার' – পরে যে দলটি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত হয়। মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন দলটি (পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি- এমএল) ছাড়া বাকীগুলো একইসাথে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ডাকও দেয়।

এদের জন্য সবচেয়ে বিব্রতকর এবং ভ্যাবাচেকা খাওয়া অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন চীন প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা শুরু করে এবং বলতে থাকে এর পেছনে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষই দায়ী। চীনপন্থীরা মনে করতো গণচীন সবসময়েই পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের বন্ধু, সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্ক। তারা ভগ্নহৃদয় নিয়ে দেখতে পেলো চীন তার পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে পাকিস্তানের মতো মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রের রক্ষকের ভূমিকায় নেমেছে। 'যার জন্য চুরি করলাম, সেই বলে চোর' এই হলো তখন চীনপন্থীদের মনের অবস্থা। সত্যিই সেইসময়টা ছিল পূর্ব বাংলার চীনপন্থীদের জন্য নিদারুণ দুর্দশার কাল।

অবশেষে দেখা গেল, নয়মাস ব্যাপী যুদ্ধের সময় চীনপন্থীদের প্রায় সবকটি দলকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হতে। এমন কি তোয়াহার নেতৃত্বাধীন দলটিও যারা যুদ্ধটাকে 'দুই কুকুরে কামড়াকামড়ি' বলে মূল্যায়ন করেছিল, পাক হানাদারদের সাথে নোয়াখালি অঞ্চলে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল শুধু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই নয়, অস্ত্র ধরতে হয়েছিল মুক্তি বাহিনী, মুজিব বাহিনী, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী এবং অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় এমন কি অন্যান্য

চীনপন্থীদের বিরুদ্ধেও। যুদ্ধের নয়মাসে বামপন্থীদের ভুমিকা নিয়ে আলোচনায় পরে আবার আসবো।

ফিরে যাওয়া যাক একাত্তরের মার্চের সেই দিনগুলোতে - আলোচনার নামে কি ঘটছিল তখন ঢাকায়? ইয়াহিয়া খান দলবল নিয়ে ঢাকায় এলেন। তার আগেই টিক্কা খানকে নিয়োগ দেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে। যদিও পঁচিশে মার্চের আগে পর্যন্ত তাঁর গভর্ণরের শপথটা নেয়া হয় নি। কারণ প্রতিবাদের মুখে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি,এ, সিদ্দিকি টিক্কা খানকে শপথ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান। (পরে খুব সম্ভবত এপ্রিল মাসে বি,এ,সিদ্দিকিই তাকে শপথ পড়ান।)

সরকার একদিকে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার তোরজোর করছে আর অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে। ভয় আর অনিশ্চয়তার মধ্যে সাধারণ জনগণের দিন কাটছে। ছাত্ররা জঙ্গী কর্মসূচী পালন করছে প্রতিদিন। মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ঘোষণা দিয়ে কুচকাওয়াজ করছে সামরিক কায়দায়। শেখ মুজিবও তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এইসব সদ্যগঠিত মিলিশিয়া বাহিনীর কাছ থেকে সামরিক কায়দায় স্যালুট নিয়ে আর দিয়ে চলেছেন নিয়মিত ভাবে। এই ব্যাপারগুলোকে সেই সময়েই আমার কাছে বাস্তবোচিত মনে হয় নি। এইভাবে একটা জাতি একটা সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবে – এটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল অবিশ্বাস্য।

চট্রগ্রামে আমরা তখন দিন কাটাচ্ছি দারুন উৎকন্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে। প্রায় প্রতিদিন বৈঠকে বসছি নেতাদের সাথে। মার্চের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে আমাদের বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজনকে চট্টগ্রাম কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে বোমা বানানোর উপযোগী কিছু কেমিক্যাল বেছে বেছে তুলে আনার দায়িত্ব দেয়া হলো। কাজটা মোটেও কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু তখন বেশ এডভেঞ্চারাস মনে হয়েছিল, রোমাঞ্চকর একটা অনুভুতিতে মনটা ছেয়ে ছিল। ল্যাবের পাহারায় ছিল একজন মাত্র সিকিউরিটি গার্ড, তাকে আমাদের দলের দুজন জোর করে দূরে কোথায়ও নিয়ে বসিয়ে রাখে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা কাজটা সেরে নিয়েছিলাম। আজ মনে হয়, আমরা কত অপরিপক্ক ছিলাম, আমাদের নেতৃত্বও কতটা অদূরদর্শী ছিল, ঐ রকম কয়েকটা পটকার মতো বোমা দিয়ে আমরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম!

সেদিনের আর একটা ঘটনা আজো মনে পড়ে। ল্যাবোরেটরিতে ঢোকার আগে আরেকটু রাত হওয়ার অপেক্ষায় আমরা পায়চারী করছিলাম কলেজের ক্যাম্পাসে। এমন সময়ে, রাত এগারটা নাগাদ হবে, দেখলাম বাংলার অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর

ফ্ল্যাটের দিকে যাচ্ছেন। সাথে আরো দু'একজন মনে হয় ছিল। তিনি ক্যাম্পাসেই থাকতেন। আমাদের দেখে থামলেন। ছাত্র হিসেবে আমরা তাঁর পরিচিত। কিন্তু একবারও জানতে চাইলেন না, আমরা অত রাতে ওখানে কি করছি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উঠলো স্বাভাবিক ভাবেই। বললেন, তিনি লালদীঘির ময়দান থেকে ফিরছেন, আজ তাঁর 'জল্লাদের দরবার' নাটকটা ওখানে মঞ্চস্থ হয়েছে। টিক্কা খানের গভর্ণর পদে নিয়োগ এবং শপথ নিতে না পারা, এসব ঘটনা নিয়ে প্রহসনমূলক একটা নাটক লিখেছেন তিনি। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে মমতাজউদ্দিন স্যার ছিলেন সামনের কাতারে। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, "স্যার, আপনার কি মনে হয়, সশস্ত্র যুদ্ধ হবে? আমরা কি স্বাধীন হবো?" সরাসরি উত্তর না দিয়ে নাটকের ভাষাতেই তিনি বলেছিলেন, "এটা বায়ান্ন নয়, একাত্তর"। হয়তো বলতে চেয়েছিলেন, আর প্রতিবাদ নয়, এবার প্রতিরোধ, এবার আর আমরা শুধু শহীদ হবো না।

পাদটীকা

[১] বুর্জোয়া শব্দটা বামপন্থীদের মুখেই বেশি শোনা যায়, তাই এই লেখায় বুর্জোয়া রাজনীতির উল্লেখ দেখে হয়তো অনেকেই মনে করবেন, আমি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একাত্তরের ঘটনাবলীর বিশ্লেষন করছি। অস্বীকার করছি না, আমার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটাকে আবৃত রাখার কোন কারণ আমি দেখি না। তবুও একটু ব্যাখ্যা দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। বুর্জোয়া কথাটা এসেছে ফরাসী বুর্জ (bourg) শব্দ থেকে, যার অর্থ শহর। তাই বুর্জোয়া শব্দের অর্থ শহুরে। শুধু শহুরে নয়, সচ্ছল শহুরে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত সাধারণ জনগণের চেয়ে এবং শহরের দিন- আনা- দিন- খাওয়া বা খেতে- না- পাওয়া শ্রমিকদের চেয়ে এরা বেশি শিক্ষিত, অগ্রসর ও প্রভাবশালী। সচ্ছল শহুরেরাই নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠক। স্বভাবতই বুর্জোয়া দলগুলো এদেরই রাজনৈতিক দল। বুর্জোয়া রাজনীতি এদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষারই রাজনীতি। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রায় সবসময়েই বুর্জোয়া রাজনীতি, যদিও বুর্জোয়া রাজনীতি অনেকসময় জাতীয়তাবাদী নাও হতে পারে। আওয়ামী লীগ একাত্তরে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধ্বজাধারী ছিল তাকে বুর্জোয়া রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বুর্জোয়া রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের জন্যে ব্যবসা- বানিজ্যে অধিক সুযোগ- সুবিধার দাবী থাকবে, শ্রমিক- কৃষকদের দাবী- দাওয়া তেমন প্রাধান্য পাবে না। আওয়ামী লীগের ছয়দফায়ও ব্যবসা- বানিজ্যে বাঙালিদের অধিকতর সুযোগ- সুবিধার দাবী প্রাধান্য পেয়েছিল। শ্রমিক- কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কথা তেমন ছিল না। বুর্জোয়া রাজনীতির লক্ষ্য থাকবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী- দাওয়া আদায়ের। শক্তি- প্রয়োগের রাজনীতি, জোর করে অধিকার আদায়ের রাজনীতি তাই সাধারণত বুর্জোয়া রাজনীতির পর্যায়ে পড়ে না।

অষ্টম পর্ব

মার্চের পনের তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকায় এলেন। পথে করাচীতে থেমে জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথেও শলা- পরামর্শ করলেন।

আলোচনা শুরু করলেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সাথে তাঁর শাসনতান্ত্রিক আর অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের নিয়ে। আর অন্যদিকে সামরিক প্রস্তুতিও চলছিল। ঢাকায় এসে প্রথমেই বসেছিলেন সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে। ইয়াহিয়া খান সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, মনে হয় না। দিনে প্রেসিডেন্ট হাউসে (এখন বঙ্গভবন) আলোচনা সেরে সন্ধ্যায় মিটিং- এ বসতেন ক্যান্টনমেন্টে।

প্রথম দুই দিন, ষোলই ও সতেরই মার্চ ইয়াহিয়া খান আলোচনায় বসেন শুধু শেখ মুজিবের সাথে, কোন পক্ষেই কোন উপদেষ্টা ছিল না। পরে যোগ দেন দুই পক্ষের উপদেষ্টারা। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় থাকতেন আওয়ামী লীগের তাজউদ্দীন, কামাল হোসেন, এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। শেখ মুজিবের ইতিপূর্বে সাতই মার্চের ভাষনে উত্থাপিত চারটি দাবী নিয়ে দেন- দরবার, অভিযোগ পাল্টা- অভিযোগ, এভাবেই প্রথম দিকে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার এজেন্ডা নিয়েও শুরু হয় বাক- বিতন্ডা। দুই পক্ষই আলোচনার টেবিলে নতুন নতুন দাবী আর ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়। সামরিক সরকার প্রথমদিকে পার্লামেন্ট বসার আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হয়, পরে অস্বীকৃতি জানায় শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সৃষ্টির অজুহাত দিয়ে। আওয়ামী লীগও অনড় অবস্থান নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। প্রথমে ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে 'ফেডারেল গভর্নমেন্ট' ধরণের সম্পর্কের কথা বললেও, পরে 'কনফেডারেশন'- এর দাবী জানায়। 'কনফেডারেশন'- ধরণের সম্পর্ক সাধারণত হয় দুই বা ততোধিক স্বাধীন দেশের মধ্যে। নিসন্দেহে, রাজপথের উত্তপ্ত পরিস্থিতিই আওয়ামী লীগকে ক্রমাগত অনমনীয় অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছিল।

ইয়াহিয়া খানের উপর্যুপরি পীড়াপীড়ি সত্বেও শেখ মুজিব ভুট্টোর সাথে আলোচনায় বসতে অনীহা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ভুট্টোও ইয়াহিয়ার তাগাদা সত্বেও সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ছাড়া মুজিবের সাথে কথা বলতে কোন উৎসাহ দেখাচ্ছিলেন না। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে না জানিয়েই ভুট্টোকে ঢাকায় আসতে রাজী করান, মুজিব কথা বলতে প্রস্তুত আছে বলে। ভুট্টো ঢাকায় আসেন মার্চের একুশ তারিখে পিপলস পার্টির আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে। এর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক

দলের শীর্ষ নেতারা ঢাকায় এসে পড়েন। ইয়াহিয়াই তাদেরকে ঢাকায় আসতে বলেন। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান আর আব্দুল ওয়ালী খান ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। ভুট্টোর আগমনে পরিস্থিতি আরো সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। রাজপথ তখন শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত, 'ভুট্টোর মাথায় লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

ভুট্টোকে ঢাকা বিমানবন্দরে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। সামরিক বাহিনীর প্রহরায় তিনি দলবল নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (পরে শেরাটন, এখন রূপসী বাংলা) ওঠেন। শেখ মুজিব পরদিন বাইশে মার্চ প্রেসিডেন্ট হাউসে ভুট্টোকে দেখলেও তাঁর সাথে আলোচনায় বসতে কোন উৎসাহ দেখালেন না। ভুট্টোও শেখ মুজিবের এহেন মনোভাবে হতাশ হলেন। এই সময়ে ইয়াহিয়া খান তাদেরকে কথা বলার অনুরোধ জানান এই বলে, "আপনার দু'জন লজ্জাবিধুর নবদম্পতির মতো আচরণ করছেন; একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন কিছুদিনের মধ্যে, আপনাদের এই আচরণ শোভা পায় না" (সিসন এন্ড রোজ [১]।

শেখ মুজিব যে কথা বলেন নি ভুট্টোর সাথে, তা কিন্তু নয়। কথা হয়েছিল দু'জনের মধ্যে একান্তে। ইয়াহিয়াকে ছাড়াই। কি বলেছিলেন তাঁরা? সিসন আর রোজ - এর লেখা বইতে উল্লেখ আছে, ভুট্টোর ভাষ্য অনুযায়ী শেখ মুজিব নাকি ভুট্টোকে বলেছিলেন মিলিটারীকে বিশ্বাস না করতে। বলেছিলেন, "আজ তারা হয়তো আমাকে শেষ করবে, তবে কাল যে তোমাকেও করবে না, তা মনে করো না"। কিন্তু অন্য যারা এই কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত তাঁরা বলেছেন, ভুট্টোই শেখ মুজিবকে সতর্ক করে বলেছিলেন, মিলিটারী কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, বাঙ্গালীদের হাতে তো কোনদিনও নয়। মুজিবের উচিত তাঁর (ভুট্টোর) সাথেই সমঝোতায় আসা।

তবে এই ঘটনা নিয়ে একটু ভিন্ন ধরনের বর্ণনাও দেখেছি । ইতালীয় সাংবাদিক ওরিয়ানা ফেলাচিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে [২] ভুট্টো বলেছেন, শেখ মুজিব নাকি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই রাতেই প্রেসিডেন্ট ভবনে নয়, অন্য কোন স্থানে গোপনে মিলিত হওয়ার জন্য; বলেছিলেন, লোক পাঠাবেন নিয়ে আসার জন্য। ভুট্টো রাজী হন নি, পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ে এভাবে গোপনে মিটিং করতে তাঁর মন নাকি সায় দেয় নি। ভুট্টোর কথা যে কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, তাঁর বানিয়ে কথা বলার অভ্যাস ছিল।

এদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন, ভুট্টোর সাথে তাঁর কোন কথাবার্তা হয় নি, তবে ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার সময় ভুট্টো সাহেব প্রেসিডেন্ট ভবনে ছিলেন।

পরিস্থিত তুঙ্গে উঠলো তেইশ মার্চ। তেইশে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে প্রতিরোধ দিবস হিসাবে পালন করার আহবান জানায় দেশবাসীর প্রতি। সেদিন আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে উল্লেখ না থাকলেও ঘরে- বাড়ীতে, মিছিলে- মিটিং- এ বাংলাদেশের নতুন পতাকা (মানচিত্রখচিত) ব্যাপকভাবে উড়তে দেখা যায়।

কোন কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ এবং তাদের কিছু অগ্রসর অংশ যে শুধু নেতৃত্বের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারে তাই নয়, বরং নেতৃত্বকেও পারে পথ দেখাতে, দিক নির্দেশ করতে। একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশে আমি তাই হতে দেখেছি। অগ্রসর অংশটা একাত্তরের পূর্ব বাংলায় ছিল ছাত্ররা। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবক্তারা হয়তো বলবেন ওই সময়ে ছাত্রদের ভূমিকা হঠকারী ছিল, শেখ মুজিবও তাদের বাড়াবাড়ির কারণে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। অনেকের মতো আমারও ধারনা, ছাত্রদের জঙ্গী মনোভাবের প্রতি শেখ মুজিবের চেয়ে তাজউদ্দিনের সহানুভূতি ছিল অনেক বেশি। স্বাধীনতার দাবী প্রসঙ্গে এই সময়ে শেখ মুজিব প্রকাশ্যে কিছুই বলেন নি। তবে ছাত্রদের নতুন বানানো পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্যালুট নিতে দেখা গেছে।

একাত্তরের মার্চে শেখ মুজিব তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে

যারা সেই সময়ে ছাত্রদের ভূমিকাকে হঠকারী মনে করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীত এদেরই অবদান। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঊষালগ্নে ছাত্রদের, বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও তার নেতাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। পরবর্তীতে (যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে) এদের অনেকেরই কার্যকলাপ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু সে আরেক কাহিনী, আরেক ব্যর্থতার ইতিহাস।

পূর্ব বাংলায় সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার আয়োজন চলছে আর শেখ মুজিবুর রহমান একেবারে কিছুই আঁচ করতে পারছেন না, তা কিন্তু ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, বাঙালিদের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হতে পারে সেই আশঙ্কা তাঁর ছিল, এবং তার পরিণতি কি হতে পারে সে সম্পর্কেও তাঁর বেশ ভালোই ধারনা ছিল। (যদিও আমার মনে হয়, তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন তাঁর এই আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়।) তা নইলে তিনি ১৬ই মার্চ বিবিসির সাংবাদিক মাইকেল ক্ল্যাটনকে বলতে পারতেন না,

> "পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে তড়িঘড়ি করে সৈন্য আনা হচ্ছে। তাঁরা দূর্গ বানাতে ব্যস্ত। এসবের উদ্দেশ্য কি? পূর্ব পাকিস্তানীরা নিরস্ত্র। আমাদের সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ। যুদ্ধ আমরা চাই না। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাবে বলে দিতে চাই সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নাই। রক্তপাত হতে পারে, এক থেকে দুই বছর - এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। নেতাদের মধ্যে অনেকেকেই জীবন বিসর্জন দিতে হতে পারে - খুবই সম্ভব। কিন্তু মানুষ বদ্ধপরিকর, তাঁদের মনোবল দৃঢ়, তাঁদেরকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হবে"[৩]।

শেখ মুজিবের এই কথাগুলো প্রফেটিক। নিজের এবং আরো অনেক নেতার মৃত্যু হতে পারে, এটাও তিনি কি অবলীলায় মেনে নিয়েছিলেন। দূর্দান্ত সাহসের অধিকারী না হলে কেউ এমন উচ্চারণ করতে পারে না।

মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, তবে ইতিহাসও ব্যাক্তিত্বের রূপায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিহাসের কোন কোন ক্রান্তিলগ্নে কোন ক্ষনজন্মা ব্যাক্তিত্ব ইতিহাস সৃষ্টি করে, আবার কখনো কখনো ঘটনাপ্রবাহ ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্বের জন্ম দেয়। একাত্তরে বাংলাদেশে কোনটা ঘটেছিল? ব্যাক্তি শেখ মুজিব ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর ব্যাক্তিত্ব দিয়ে, না ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছিল? এ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তর্ক হতে পারে। সেই তর্কে আমি যাবো না। এই লেখার উদ্দেশ্য সেই তর্কের সূচনা বা নিরসন কোনটাই নয়। তবে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন সেই দুইবছরের - ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারী থেকে একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত -ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। শেখ মুজিবের শত্রুরাও এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। শেখ মুজিব সেদিন

পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীর কন্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন ওই দুইবছরে, হয়ে উঠেছিলেন এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী প্রেরণার উৎস বাঙালিদের কাছে।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্ব ও তার ভাবমূর্তি নিয়ে একটা কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করছি। কালের আবর্তে এই ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে অনেক ঘটনার বর্ণনায় আর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষে- বিপক্ষে দুটি দল তৈরী হয়ে যায়। পক্ষের দল গড়ে তোলেন এক দেবতার ভাবমূর্তি, বিপক্ষের দল এক দানবের। বাস্তবতা হয়তো কোনটার সাথেই মেলে না। কিছু সত্যি ঘটনা হারিয়ে যায়, কিছু মিথ্যে রটনা সত্যি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এই ব্যাক্তিত্বদের নিয়ে যে কোন যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ বলি হয় আবেগের আর মোহের যুপকাষ্ঠে। বিশ্লেষণকারীর, সত্য অন্বেষণকারীর ভাগ্যে অপবাদ জোটে দালালীর, হয় এই পক্ষের নয়তো অন্য পক্ষের। তাই সিরাজুদ্দৌলাকে কেউ বলেন লম্পট, মদখোর, যোগ্যতাহীন, কেউ বলেন ভাগ্যাহত শহীদ দেশপ্রেমিক শেষ স্বাধীন নবাব। গান্ধী অনেকের কাছেই অহিংসা আর শান্তির ধ্বজাধারী মহাত্মা, আবার কারো কারো কাছে ধর্মান্ধ, গোঁড়া, বিজ্ঞানবিমুখ, চতুর রাজনীতিক।

আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটে সেদিন তেইশে মার্চ। বেতারে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার বদলে 'রেডিও ঢাকা' শোনা যেতে থাকে। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারই বন্ধ করে দেয়া হয়, সামরিক বাহিনীর দূর্ব্যাবহারের প্রতিবাদে। অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সামরিক অফিসারদের সভায় কর্নেল (অব) এম এ জি ওসমানী আর মেজর জেনারেল (অব) এম ইউ মাজিদ বক্তৃতা করেন। তাঁরা সভার পরে ধানমন্ডিতে গিয়ে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। শেখ মুজিব যে গাড়ীতে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন তাতে শোভা পাচ্ছিল বাংলাদেশের পতাকা। এ নিয়ে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে।

এই ঘটনাগুলোকে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রমাণ হিসেবে প্রচার করা হয়, তখন এবং এখনও। পাকিস্তানী লেখকেরা, যেমন সিদ্দিক সালিক [৪] এবং ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানী উপদেষ্টারা, যেমন, এম, এম, আহমেদ (হাসান জহীর [৫]), ফলাও করে এই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দেন। উদ্দেশ্য, প্রমাণ করার চেষ্টা যে, বাঙালিদের উস্কানিমূলক আচরণই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বাধ্য করে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে।

ইয়াহিয়া খান তাঁর ছাব্বিশে মার্চের বেতার ভাষনে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার এবং শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করার কারণ হিসেবে এবং দেশদ্রোহিতার আলামত হিসেবে এগুলোর উল্লেখ করেন।

কিন্তু আরো কিছু ঘটনা ঘটছিল তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে। সাদা পোষাকে সৈন্য আমদানী চলছিল পি আই এ- র বিমানে প্রতিদিন। এম ভি সোয়াত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভেড়ে সেই আটাশে ফেব্রুয়ারী। চট্টগ্রাম বন্দরের বাঙ্গালী অফিসার ও শ্রমিকরা মাল নামাতে অস্বীকৃতি জানায় তাই জাহাজটা বহির্নোঙ্গরেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত।

তেইশে মার্চ ঢাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলেও প্রেসিডেন্ট ভবনের আলোচনায় মোটামুটি সন্তুষ্ট তিন পক্ষই - সত্যতা যাই থাকুক, সেই রকমই ধারনা দেয়া হচ্ছিল বহির্বিশ্বকে। সমঝোতা হবে বলে মনে হচ্ছে, এমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছ থেকে। সামরিক আইন তুলে নেয়ার সরকারী ঘোষণার খসড়া নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে পরদিন, চব্বিশ তারিখে।

শুধু উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হয় চব্বিশে মার্চ। তখন অনেকেরই জানা ছিল না এটিই শেষ আলোচনা বৈঠক – পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টায়। আলোচনা হয় 'প্রেসিডেন্সিয়াল প্রক্লেমেশন'- এর খুঁটিনাটি নিয়ে। বৈঠক শেষে তাজউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই, তবে উপদেষ্টা স্তরে আরো দু'একবার বসতে হতে পারে ঘোষণাটির চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য। সংকটের নিরসন হতে যাচ্ছে, তাঁর কথায় এমনই আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি যে শক্ত, অনড় অবস্থানে থেকে কথা বলছিলেন তাও স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্ত আজ আমরা জানি, আর্মি কমান্ড মার্চের বিশ তারিখেই সামরিক কায়দায় সঙ্কট সমাধানের প্রস্তাব দেয়। তেইশ তারিখ বিকেলে ইয়াহিয়া খান সেই প্রস্তাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন [৬]।

পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকরা একে একে ফিরে গেলেন, যাওয়া- আসার পথে সাংবাদিকদের আশার বাণী শোনাতে থাকলেন, "আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে"।

পঁচিশ মার্চ বিকেলে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে শেখ মুজিব দেশবাসীর প্রতি সাতাশে মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের আহবান জানালেন । কয়েক ঘণ্টা পরেই ইতিহাসের এক বীভৎস অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে – মনে হয় না, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কারোরই এ সম্পর্কে কোন ধারনা ছিল।

তথ্যসূত্র – অষ্টম পর্ব

[১] Sisson, R. and Rose, L.E., *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, 1990, p. 122.

[২] Oriana Fallaci, *Interview with History*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1976, p. 193.

[৩] Sisson, R. and Rose, L.E., *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh,* University of California Press, 1990, p. 293.

মাইকেল ক্ল্যাটনের প্রশ্নটা ছিল, "এই অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বাধীনতার শ্লোগান কি আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বন্ধ করে দেবে না ?"

[৪] Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, Oxford University Press, Karachi, 1977.

[৫] Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, Oxford University Press, Karachi, 1994, p. 158-9.

[৬] Sisson, R. and Rose, L.E., *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh,* University of California Press, 1990, p. 133..

নবম পর্ব

পঁচিশে মার্চের রাতে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রোডের সেই ঘটনাবহুল বাড়িটিতে বসে শেখ মুজিব কাকে কি বলেছিলেন তা নিয়ে অনেক রকমের কথা শোনা যায়। সবাই সবকিছু নিজ কানে শুনেছেন বা স্বচক্ষে দেখেছেন বলে দাবী করেন, যদিও একজনের কথার সাথে আরকেজনের ভাষ্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শেখ মুজিব যে তাঁর সহকর্মীদের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলেছিলেন এবং নিজে গ্রেফতার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন তা নিয়ে সন্দেহে থাকার কোন অবকাশ নেই।

পঁচিশে মার্চ ১৯৭১

আমি নিশ্চিত আওয়ামী লীগের নেতাদের কোন ধারণাই ছিল না, মিলিটারি সে রাতে অপারেশন সার্চলাইটের নামে জঘন্য, পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ শুরু করবে ঢাকায়। তখনকার আওয়ামী লীগের মতো একটা দলের ইন্টেলিজেন্স যে এতো দূর্বল হতে পারে জেনে বিস্মিত হতে হয়। সে রাতে ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের খবরটাও নাকি আওয়ামী লীগ নেতারা জানতেন না। রাত এগারোটার দিকে তাঁদেরকে এই খবরটা জানিয়েছিলেন তেজগাঁ এয়ারপোর্টে কর্মরত এয়ারফোর্সের বাঙালি অফিসার উইং কম্যান্ডার এ.কে. খন্দকার (পরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার)।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও যে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন তা নয়। এমন কি ঝানু সাংবাদিকরাও কিছুই জানতেন না। অনেককে পত্রিকার অফিসেই প্রাণ দিতে হয়েছে।

পাকিস্তানী মিলিটারিও ইন্টেলিজেন্সের বাঙালি অফিসারদের ওপর নির্ভর করতে পারে নি। তাই দেখা যায় শেখ মুজিব আর কামাল হোসেন ছাড়া আওয়ামী লীগের কোন বড় নেতাই ধরা পড়ে নি। তাঁরাও গ্রেফতার এড়াতে চান নি বলেই এমনটি ঘটেছে।

সে রাতে মিলিটারির টার্গেট ছিল, প্রথমত, পিলখানায় ইপিআর আর রাজারবাগে পুলিশের ওপর আক্রমণ - উদ্দেশ্য ছিল এদেরকে নিরস্ত্র করা। দ্বিতীয়ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর আক্রমণ। হয়তো তাদের ধারণা ছিল ছাত্রদের হাতে অস্ত্র রয়েছে।

কিন্তু শিক্ষকদের কয়েকজনকে ধরে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হিংসাপ্রসূত ছিল বলে আমার মনে হয়। শহীদ মিনার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলাখ্যাত সেই ঐতিহাসিক বটগাছটাকে উপড়ে ফেলার পেছনে মাথামোটা পাকিস্তানী সৈন্যদের কি মোটিভ ছিল আমি ভেবে পাই না। একটা মাত্র কারণ ছাড়া, আর তা হলো এদের উপরস্থ কারো মনে হয়েছে এগুলোকে ধ্বংশ করার মাধ্যমে বাঙালির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপরে উপযুক্ত আঘাত হানা যাবে।

পঁচিশে মার্চের রাতেই আমরা চট্টগ্রামে খবর পেলাম ঢাকার রাস্তায় আর্মি নেমেছে। রেডিও নিস্তব্ধ, সাড়া- শব্দ নেই। মানুষ ভীতবিহবল, সন্ত্রস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই, রাত একটা-দেড়টা নাগাদ, শোনা যেতে থাকলো প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ। বন্দরের দিক থেকে শব্দ আসছে মনে হচ্ছিল। পরে জানা গেলো কামানের গোলা ছোঁড়া হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা যুদ্ধজাহাজ 'বাবর' থেকে। ভাগ্যক্রমে সে রাতটা আমরা নিরাপদেই ছিলাম। সকাল (ছাব্বিশে মার্চ) হতেই বেরিয়ে পরলাম রাস্তায়।

শহরের বড় বড় দোকান, খাতুনগঞ্জ- চাক্তাইয়ের পাইকারী বাজার, বক্সির বাজার, রিয়াজুদ্দিন বাজার, বিপনিবিতান - সব বন্ধ, কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই। পাড়ার ছোট দোকানপাটগুলো আংশিক খোলা রেখে দোকানী কোনরকমে বেচাকেনা চালাচ্ছে। দু'একটা রিকসার গন্তব্যহীন চলাচল, দু'চার জন মানুষের ইতস্তত পদচারণা, তাদের ভীতসন্ত্রস্ত আলাপচারিতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভয়ার্ত চাহনি - চিরচেনা চট্টগ্রাম শহরকে একরাতের মধ্যে ভীষণ অপরিচিত করে দিল আমার কাছে।

উৎসুক কয়েকজনকে দেখলাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেতে, পায়ে হেঁটেই। ওখানে নাকি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমানকে দেখলাম একটা হুড নামানো রিকশায়। মনে হলো এখনো ঠিক বুঝতে পারছেন না পুরোপুরি প্রকাশ্যে আসবেন কিনা – তাঁর ওপরে হুলিয়া (গ্রেফতারি পরোয়ানা) জারী করেছিল সামরিক সরকার।

দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম বেতার থেকে শুনতে পেলাম, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, এবং নিরাপদ অবস্থান থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে

যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম বেতার তখন নিজেদের "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" নামে পরিচয় দিচ্ছিল।

দারুণ উৎকণ্ঠা, সীমাহীন উদ্বেগ আর প্রচন্ড ভয় নিয়ে বাবা- মা ভাই- বোনদের সাথে নির্ঘুম রাত কাটালাম আমরা বাড়িওয়ালার পাকা বাড়ির ড্রয়িং রুমে। আমাদের ভাড়ার বাসাটা ছিল ছাপড়া টাইপের, নিম্নমধ্যবিত্তের মাথা গোঁজার ঠাঁই। এর মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমার চাচাতো বোন আর তাঁর পরিবার। দুই পরিবারে মিলে আমরা দশজন। আমাদের গ্রাম থেকে আসা কাজের ছেলেটা, আঠারো- ঊনিশ বছর বয়স, কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল। আমাদের সাথে থাকাটাকে সে আর নিরাপদ ভাবতে পারছিল না।

আমারা চিন্তা করতে লাগলাম কি ভাবে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যাওয়া যায়।

ছাব্বিশ তারিখ রাতে ইয়াহিয়া খান বেতারে ভাষণ দিলেন। ঢাকার রেডিও স্টেশন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে সেনাবাহিনীর তত্বাবধানে। বললেন, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ইত্যাদি। চট্টগ্রামে অনেকেই তখনো বিশ্বাস করছিলেন না, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে (পশ্চিম) পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জিয়াউর রহমান

সাতাশ তারিখের রাতটাও আমরা কাটালাম বাড়িওয়ালার ড্রয়িং রুমে। সে দিনেই মনে হয় দুপুর কিংবা বিকেলের দিকে, জিয়াউর রহমানের গলা শোনা গেল চট্টগ্রামের কালুরঘাটের অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে। ইংরেজিতে পড়া হয়েছিল

ঘোষণাটা। "আই, মেজর জিয়া,..."। এর পরে থেকে 'শেখ মুজিব আমাদের সাথে আছেন', এই কথাটা আর শোনা গেল না।

আটাশ তারিখে আমরা কিছুটা পায়ে হেঁটে, কিছুটা রিক্সায় নৌকার আশায় নদীর ধারে গেলাম। নৌকা পাওয়া গেল, পটিয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে। আমাদের মতো আরো অনেকেই তখন প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে। নৌকার মাঝি সন্দেহ করে বসলো আমাদের মধ্যে দু'একজন বিহারী হতে পারে। প্রকাশ্যেই বললো তার সন্দেহের কথা। আমার বড়ভাই, আমারই কাছাকাছি বয়সের, কিছুটা দীর্ঘকায় - আর আমার ভাগ্নী, আমার চাচাতো বোনের মেয়ে, সেও আমারই বয়সের, কিছুটা গৌরবর্ণ - তাতেই মাঝির মনে সন্দেহ পাকাপোক্ত হয়ে গেছে – এরা, বিশেষ করে এই দু'জন বাঙালি নয়; 'এরা আমাদের লোক নয়'।

চাটগাঁ শহরের কেন্দ্র থেকে নদীর ঘাট, দূরত্ব তিন- চার মাইলের বেশি হবে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক দূরত্ব, যার কারণ মূলত অর্থনৈতিক, যে কত বিশাল হতে পারে উপলব্ধি করে বিস্মিত হলাম। সেদিন সেই ভীতিকর পরিস্থিতিতেও এই ভাবনাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আসলেই তো, আমরা বাঙালি হলেও নৌকার মাঝিদের জাতের (শ্রেণীর) নই, তাতে কি সন্দেহ আছে!

শেষতক বেশি কথা না বাড়িয়ে মাঝি আমাদের নৌকায় তুলে নিল। নৌকা চলতে শুরু করলেই দেখতে পেলাম নদীতে ভাসছে লাশ - বেশ কয়েকটা। হতভাগ্য বিহারীদের। বিনাদোষে মরতে হলো ওদের। শেখ মুজিব সাতই মার্চের ভাষণে এই আশঙ্কা করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা যেন অবাঙালিদের জানমালের ক্ষতি না করি, আমাদের যেন বদনাম না হয়। নেতাসুলভ দিকনির্দেশনা ছিল তাঁর এই সতর্কবাণীতে।

কিন্তু অন্তত চট্টগ্রামে তাঁর এই কথা কোন কাজে আসে নি। আমরা আজো সেই বদনামের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। শুনেছি, চট্টগ্রামের ইস্পাহানি কলোনিতে বিহারীদের জবাই করে তেলের খালি ড্রামে রক্ত জমা করা হয়েছিল। পরে সেই রক্ত বাঙালি যোদ্ধাদের কাজে লাগবে এই যুক্তিতে। বড় অদ্ভুত আর নৃশংস সেই যুক্তি!

ঘন্টা দুয়েক নৌকায় চলার পরে আমরা পটিয়া পৌঁছলাম। সৌভাগ্যক্রমে একটা মাইক্রোবাস পাওয়া গেল আমাদের গন্তব্য গ্রামে যাওয়ার জন্য। আরাকান রোড ধরে বাস চললো আরো প্রায় ঘন্টা চারেক কক্সবাজারের দিকে। পথে পথে ব্যারিকেড। জয় বাংলা স্লোগানে উচ্চকিত জনপদ, হাটবাজার। লাঠিসোটা নিয়ে তরুণ যুবকরা প্রতিটা গাড়ি থামাচ্ছে আর চেক করছে। কারো কারো হাতে একনলা- দোনলা বন্দুকও দেখা গেল।

অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গ্রাম হারবাং- এ। আরো আটমাইল আগে চুনতি- তে নেমে গেলেন আমার চাচাতো বোন আর তার পরিবার।

এই সেই হারবাং, আমার প্রিয় গ্রাম, যেখানে কেটেছে আমার শৈশব, কৈশোর। মায়ের কোলের মতোই মমতাময় স্নিগ্ধতায় ভরা হারবাং। হারবাং- এ পৌঁছে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

গ্রামের পরিচিত যুবকদের দেখলাম প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবকিছুই অনিশ্চিত। আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বয়স্করা উদ্বিগ্ন। চুরি- ডাকাতি বেড়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করছেন তাঁরা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রাণভয়ে ভীত। সবকিছু মিলিয়ে একটা থমথমে ভাব।

যে কোন মূহুর্তে আর্মি এসে পড়তে পারে, সবার মনেই এই ভীতি। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আর্মি কক্সবাজার শহরের দখল নিয়ে নিল। হারবাং- এর ওপর দিয়েই তাদের যেতে হয়েছে কক্সবাজারে আরাকান রোড ধরে। কিন্তু তারা হারবাং- এ থামে নি। কোন এক অজানা কারণে যুদ্ধের নয়মাসের মধ্যে হারবাং- এ আর্মি একবারও আসে নি। তবুও সবাই প্রকাশ্যে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়েছে তাদের বাড়িতে, দোকানে, বাজারে। গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া সবাই ছিল স্বাধীনতার পক্ষে।

সাধারণত গ্রামে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে বা বজায় থাকে তাতে দেখলাম চিড় ধরেছে। কেউ কারো ওপরে ঠিক আস্থা রাখতে পারছেনা। কেউ হয়তো মুখে বলছেনা কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বাধীনতার বিপক্ষে, আবার অন্য কেউ হয়তো সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু তথ্যটা গোপন রাখছে।

সবচেয়ে বেশি মুস্কিলে পড়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। তাদের পৃথিবী চোখের সামনে যেন হঠাৎ করে বদলে গেল, যাদেরকে মনে হতো আপনজন, সেই বন্ধু- প্রতিবেশীদের ওপরেই আর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। তাদের বাড়িঘর, জমিজমা, গরুছাগল, সহায়- সম্পদ, এমন কি স্ত্রী- কন্যারাও রেহাই পাবে বলে মনে হচ্ছে না এদের লোভের থাবা থেকে। তার ওপরে যে কোন মূহুর্তে আর্মির হাতে জীবন যাবার আশঙ্কাতো আছেই।

তবুও যুদ্ধের নয়মাসে দু'একটা বিচ্ছিন্ন চুরির ঘটনা ছাড়া হারবাং গ্রামটা শান্তই ছিল। স্কুল ছাড়া সবকিছুই চলেছে, সীমিত পরিসরে । হাটবাজার, কৃষিকাজ, ধর্মকর্ম চলেছে মন্থর গতিতে, কিন্তু একবারে থেমে যায় নি। আর্মির না আসাটা এর পেছনে একটা বিরাট

কারণ। তবুও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই চুপেচাপে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। আগস্ট মাস পর্যন্ত আমরা হারবাং- এ ছিলাম। আমার অলস কিন্তু অস্থির সময় কাটছিল তখন।

আকাশবাণী আর বিবিসির খবরে জানতে পারলাম, কুষ্টিয়ার ভারতের সীমান্তে বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর নাম দিয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। সতেরই এপ্রিল ঘোষিত হয়েছিল এই সরকার। আওয়ামী লীগের তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কর্নেল ওসমানী, খোন্দকার মোশতাক, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এঁরাই ছিলেন অস্থায়ী সরকারের মূল নেতৃবৃন্দ। কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আগেই।

আমি যুদ্ধের ভারত- নির্ভর চরিত্রটাকে ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না। পশ্চিম বাংলার বামপন্থীদের (নক্সাল এবং সিপিএম) ওপর ইন্দিরার কংগ্রেস সরকারের নিপীড়ন- নির্যাতন বাংলাদেশের জনগণের ওপর ইয়াহিয়ার বর্বর পাকসেনাদের আগ্রাসনের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি- সংযোগ কোনটাতেই ভারতের সিআরপি (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ) পাক হানাদারদের চাইতে পিছিয়ে ছিল না। সেই ভারত সরকার আর তার প্রতিভু ইন্দিরা গান্ধীর ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়লো আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। মুজিবনগর যে কোলকাতার থিয়েটার রোডের একটা বাড়িতে আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও যে কোলকাতাতেই তাতো আর কারো কাছেই অজানা ছিল না।

আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আমার আস্থা ছিল না। সেই আওয়ামী লীগই এই যুদ্ধের নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগ তখন (একাত্তরে) মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তা যে মেকি, তা বুঝতে আমার মতো অর্বাচীনেরও কষ্ট হয় নি। ক্ষমতায় গেলে যে আওয়ামী লীগ জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবেনা বা করতে পারবেনা তা নিয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

হারবাং আর আশেপাশের গ্রামে অবস্থানকারী আমাদের ছাত্র সংগঠনের দু'একজনের সাথে দেখা হলো। তারাও আমার মতো বিভ্রান্ত। কিন্তু দেশকে হানাদারমুক্ত করতেই হবে, এ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি কারো মনে ছিল না।

কোলকাতায় অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (ততদিনে 'বিপ্লবী' শব্দটা খসে পড়েছে) তখন পুরোপুরি চালু। নিয়মিত শুনতাম। এম.আর. আখতার মুকুলের 'চরমপত্র' শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। যুদ্ধটা ততদিনে আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকায় প্রায় প্রতিদিন এ নিয়ে খবর- আলোচনা পরিবেশিত

হচ্ছে। ভারতের আকাশবাণীতো আছেই। বিশ্ব রাজনীতি আর কূটনীতির অঙ্গনে ঝড় তুলেছিল বাংলাদেশ পরিস্থিতি।

মাত্র ছয় বছর আগেও আমি এই হারবাং- এর প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভের ছাত্র ছিলাম। তাই আমার বয়সের অনেক বন্ধুবান্ধব তখন গ্রামে ছিল। তাদের সাথে আড্ডা মেরে ভালোই সময় কাটছিল আমার। কিছু বইপত্রও যোগাড় করেছিলাম এর- ওর কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছিলাম বর্ষার ভরা মওসুমে গ্রামবাংলার প্রকৃতি। হাইস্কুলে পড়ার জন্য শহরে চলে যেতে হয়েছিল, তাই এই সুযোগ থেকে গত ছয় বছর ধরে বঞ্চিত ছিলাম। এই প্রকৃতি আমার চেনা, তবুও সতের বছরের না- কিশোর না- যুবক হৃদয়ে ভিন্ন এক দ্যোতনা নিয়ে ওই সময়ে ওই প্রকৃতি আমার কাছে মোহময় হয়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশের অন্য আর পাঁচটা গ্রামের মতোই হারবাং। এর অধিকাংশ অধিবাসী ভূমিহীন কৃষক। জমিদারের জমি বর্গায় চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। অনেকেরই বর্গা নেয়ার মতো সহায়- সম্পদও নেই। গতর খাটে তারা বর্গাদারের ক্ষেতমজুর হয়ে। এদের জীবনে কোন স্বপ্ন নেই। জীবনে যে স্বপ্ন থাকতে হয় তাও এদের জানা নেই। এদের জীবন নিয়ে নিয়তি যে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

সেই এরাই একাত্তরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। মুক্তির স্বপ্ন। শুধু হানাদারদের থেকে মুক্তি নয়, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, অভাব থেকে মুক্তি।

তাদের চোখেমুখে আশা আর বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন হলে সেই স্বপ্নের মুক্তি এসে ধরা দেবে হাতের মুঠোয়। মুক্তির আকাংখায় উজ্জীবিত গ্রামের কৃষক, দেশ স্বাধীন হলেই তারা পেতে শুরু করবে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য। ওইটুকুই ছিল তাদের চাওয়া। দু'মুঠো ভাত আর এক টুকরো কাপড়ের জন্য মাথা কুটে মরতে হবে না আর। স্বপ্নের ওই মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে রাজী ছিল ওরা একাত্তরে।

দশম ও শেষ পর্ব

অগাস্টের কোন এক সময়ে আমরা শহরে ফিরে এলাম। খবর নিয়ে জানলাম, আমার সমমতের সাথীদের অনেকেই তখনো নিজ নিজ গ্রামে - কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে ইতিমধ্যে। এদের একজন নিয়মিত আসা যাওয়া করেন এপারে। আমরা যারা তখন শহরে ছিলাম তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। চট্টগ্রামে আমাদের ছাত্র সংগঠনের (বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন) নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার হতাশা আরো বেড়ে গেল। যুদ্ধের ভারত- নির্ভর চরিত্রটা মেনে নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হলো, ভারতের মাটিতে থেকে যতই স্বকীয়তা বজায় রেখে আমরা বামপন্থীরা যুদ্ধ করতে চেষ্টা করিনা কেন, এইভাবে যুদ্ধ করা আর আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করা একই কথা।

মস্কোপন্থী সমাজতন্ত্রীরা এই লেজুড়বৃত্তি করাটাকেই তখন সঠিক স্ট্র্যাটেজি মনে করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেরুকরণের ফলে তখন ভারতের ইন্দিরা সরকারের সাথে ব্রেজনেভের সোভিয়েত রাশিয়ার দারুণ মাখামাখি। স্বভাবতই ভারতের মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টরা তখন ইন্দিরা- তোষনে ব্যস্ত। একই কারণে বাংলাদেশের মস্কোপন্থীরা ভারতে অন্যান্য বামপন্থীদের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল [১]।

তবুও, সিপিআই (মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া)- এর অভিভাবকত্বে থাকা সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগ আর ভারত সরকারের হাতে তাদের কম হেনস্থা হয় নি। আওয়ামী লীগের একাংশ (শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বাধীন) তাদেরকে ভীষণ অপছন্দ করতো। আর আমরাতো আওয়ামী লীগের কাছে চিহ্নিত শত্রু ছিলাম আগে থেকেই। আওয়ামী লীগও আমাদের বিবেচনায় মিত্র ছিল না।

আমাদের নেতারা ভারতে সিপিএম (কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া- মার্ক্সিস্ট)- এর সহানুভূতি পেয়েছিলেন। সিপিএম- এর সাহায্য এবং আশ্রয় তাদের জন্য ভারতে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। সিপিএম তখন সোভিয়েত রাশিয়া আর চীনের প্রভাবমুক্ত হয়ে এক স্বতন্ত্র ধারার 'কম্যুনিস্ট' রাজনীতির সূচনা করেছিল ভারতে। তারা ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল, মূলত পশ্চিম বাংলায় আর কেরালায়।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ধারার রাজনীতির সাথে সিপিএম-এর রাজনীতির তেমন কোন বৈপরীত্য ছিল না। তবে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন আর নির্বাচনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হলেও বামপন্থী হওয়ায় এই দলটির মেনিফ্যাস্টোতে কৃষক-শ্রমিকদের দাবীদাওয়ার কথা অন্যান্য বুর্জোয়া দলের চেয়ে বেশি থাকতো। পশ্চিম বাংলায় তারা তাদের এই ধারার রাজনীতিতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা আর সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল। কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের ক্ষমতাও দখল করেছিল । শুধু তখনই নয়, পরবর্তীতেও বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের এই জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন থাকে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে তারা পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় ছিল। অতি সম্প্রতি, এই বছরের (২০১১) মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা হেরে যায়। তবে এদের রাজনীতিকে সত্যিকারের কম্যুনিস্ট রাজনীতি বলা যায় না। কাস্তে-হাতুড়ি প্রতীক নিয়ে রাজনীতি করলেও শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কাজ একটাই - পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখা। তাই হয়েছে পশ্চিম বাংলায়। নান্দীগ্রাম আর সিঙ্গুরের ঘটনায় সিপিএম হালে কৃষকের স্বার্থবিরোধী দল হিসেবে কুখ্যাতি পেয়েছে।

একাত্তরে পশ্চিম বাংলায় সিপিএম অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি ছিল। প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় আমি এখানে হায়দার আকবর রনোর লেখা বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ থেকে সিপিএম-এর প্রভাব সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা পাওয়া যাবে, তেমনি বাংলাদেশের বামপন্থীরা ভারতে কেমন 'আপ্যায়ণ' পেতেন তারও কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে [২] ।

> "শুধু আর্থিক সাহায্য বা আশ্রয়দানই নয়, ভারতে আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নেও সিপিআই(এম)'র ভূমিকা ছিল বড় রকমের। তখন ভাসানী ন্যাপ বা বাম কমিউনিস্টদের ভারত সরকার মোটেই ভালো চোখে দেখত না। প্রায়ই আমাদের কর্মীরা গ্রেফতার হতেন। কেউ কেউ নিখোঁজও হয়েছেন। একবার আগরতলায় ভাসানী ন্যাপের কয়েকজন গ্রেফতার হন। আমাদের কর্মীরা ছুটে গেল কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে। সব শুনে কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী সোজা চলে গেলেন আগরতলাস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে। শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন সেখানে। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী জানতে চাইলেন, 'ন্যাপ কর্মীরা এ্যারেস্ট হয়েছেন কেন?' শেখ মনি বললেন, আমি কি জানি দাদা, এতো ভারত সরকারের ব্যাপার'। এবার নৃপেন চক্রবর্তী বললেন, 'আপনারা না বললে ভারত সরকার কিভাবে জানবে কে ন্যাপ, কে কমিউনিস্ট, কে আওয়ামী লীগ? – আমি চাই আজকেই এদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। মনে রাখবেন, এখানে সিপিআই(এম) একটা শক্তি। আমাদের সহযোগিতা না পেলে, যেখান থেকে এসেছেন সেখানে চলে যেতে হবে। মাসি-পিসি (অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী) আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলার জনগণের সমর্থন নিয়েই থাকতে হবে'। এই ধমকে কাজ হয়েছিল। বন্দী ন্যাপ কর্মীরা সেইদিনই ছাড়া পেয়েছিলেন"।

আগেই বলেছি মস্কোপন্থীরা ছাড়া অন্য সব বামপন্থীদের বড়ই দূর্দিন যাচ্ছিল তখন। চীনপন্থীরাতো বটেই, স্বতন্ত্র ধারার বামপন্থীরাও বেকায়দায় ছিলেন। নির্মল সেন ও তাঁর দল আর এস পি'র (রেভ্যুলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি) রাজনীতি চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাবিত ছিল না। কিন্তু দুয়েকটা ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছিল সীমিত। ভারতে তাঁদের অবস্থাও ভালো ছিল না। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই, "আমার জবানবন্দী"– তে তিনি তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন [৩]।

ইন্দিরা গান্ধী

অন্যান্য বামপন্থীরা তখন কি করছিল? তখন আমার পক্ষে বিস্তারিত জানা সম্ভব ছিল না। পরে জানতে পেরেছি, বেশ কয়েকটা বামপন্থী দল বা উপদল বিভ্রান্তি সত্ত্বেও, নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেশব্যাপী সাংগঠনিক বিস্তার না থাকলেও শক্তিশালী আঞ্চলিক সংগঠন ছিল এইসব দলগুলির।

সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বরিশালের পেয়ারাবাগানে। এই প্রতিরোধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন, এমন একজন, ঝালকাঠির অঞ্জলি রায় গুপ্তার মুখে শোনা যাক [৪],

> "একসময় গুলি থেমে গেলে গর্ত থেকে বেরিয়ে দেখি, পুরো জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওদিকে আগুনে আমাদের বিশাল বাড়ি পুড়ে ছাই। সেই ছাই ছুঁয়ে আমরা ভাইবোনরা শপথ নিলাম, দেশ

শত্রুমুক্ত করব। বাবা সুশীল কুমার রায় শুধু একটি বাক্যই উচ্চারণ করলেন। বললেন, 'মরতে যখন হবেই, একটা পাকিস্তানি সেনা মেরে তারপর মরো।' আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারিখটা মনে নেই। যতটা মনে পড়ছে, তখন ছিল মে মাস। বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার উত্তর- পশ্চিমে বিলের মধ্যে পেয়ারাবাগানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলাম। আমার সঙ্গে একমাত্র ভাই শ্যামল রায় আর তিন বোন_ সন্ধ্যা রায়, মণিকা রায় ও সুদীপ্তা রায় সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে পেয়ারাবাগানে যুদ্ধে অংশ নেয়"।

সিরাজ শিকদারের দলে যুদ্ধ করেছেন, এমন আরেকজন, আলমতাজ বেগম – যুদ্ধের সময় নবম শ্রেণীতে পড়তেন। আলমতাজ বলেছেন সিরাজ শিকদারের দলে থাকাকালীন সময়ে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের কথা [৫]।

সিরাজ শিকদার

সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, সদ্যবিধবা শোভা রানী মন্ডল, নিজ ভাষ্য অনুযায়ী, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে। যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর [৬]।

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী কম্যুনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন হায়দার আকবর খান রনো। তাঁর নিজ দল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র তৎপর ছিল শিবপুর অঞ্চলে মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে [৭]।

ভাষা আন্দোলনের কিংবদন্তীতূল্য সৈনিক আব্দুল মতিনও চীনপন্থী 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি নিজে এবং তাঁর পার্টি যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে সক্রিয় ছিল।

আর ছিলেন লেঃ কর্নেল তাহের। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে গোপনে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত হয়ে এই বীর যোদ্ধা দেশে এসেছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহন করার জন্য। তাহের ময়মনসিং- এর হালুয়াঘাটে সম্মুখ যুদ্ধ করে পা হারিয়েছেন। তিনিও দেশের মাটিতে থেকেই যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র কিরকম হওয়া উচিত এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল তাহেরের। তাই হয়তো পরে বলতে পেরেছিলেন [৮],

> "১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্বাভাবিক বিজয়ের ফলশ্রুতি ছিল না। ১৬ ডিসেম্বর ছিল দেউলিয়া রাজনীতির অধৈর্যতার ফল। তথাপি মুক্তিযোদ্ধারা তখন সশস্ত্র চরম শক্তির অধিকারী। কিন্তু নেতৃত্বের শূন্যতায় কখন যে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার হাত বদল হয়ে গেলো তা মুক্তিযোদ্ধারা উপলব্ধি করতে পারলো না। শুধু মুক্তিযোদ্ধা কেন , সরল প্রাণ বাংলার মানুষও বুঝতে পারলো না যে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃতরুপে নিশ্চল করে দেয়া হয়েছে। জয়ী হয়েও মুক্তিযোদ্ধারা হেরে গেছে"।

বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু দেশের মাটিতে থেকে যুদ্ধ করেছেন এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ে কাদের সিদ্দিকী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছুটিতে ছিলেন নিজ এলাকা টাঙ্গাইলে। তিনি টাঙ্গাইলের ছাত্রযুবকদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েও তিনি স্বতন্ত্র ধারায় দেশের মাটিতে থেকে নিজস্ব কাদেরিয়া বাহিনী সংগঠিত করেন। তাঁর বাহিনীতে তিনি বামপন্থীদেরও যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতে আর দেশের মাটিতে বামপন্থী দলগুলোর ভুমিকা আর কার্যক্রম সম্পর্কে আমি একাত্তরের সেই দিনগুলোতে তেমন কিছুই জানতাম না। জানার উপায়ও ছিল না। ওপরে যা লিখলাম তা জেনেছি অনেক পরে। জেনে বুঝতে পেরেছি, আমাদের যুদ্ধের ওপরে ভারত সরকারের কর্তৃত্ব, আমি তখন যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও, অনেক বেশি প্রবল ছিল।

উপলব্ধি করতে পেরেছি, কেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অভিজ্ঞ, আর স্বাধীনচেতা রাজনীতিক শেখ মুজিব ভারতের নুন খেতে চান নি, কেন তিনি পঁচিশে মার্চের রাতে ভারতে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্বেও, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বসেছিলেন। সাহসী মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন বিচক্ষণও, অন্তত তাঁর ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা চলে। আমরা জানি, মওলানা ভাসানীকেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল ভারতে। ভারতে গেলে শেখ মুজিবেরও যে একই পরিণতি হতো না, নিশ্চিত করে বলার উপায় নাই।

স্বভাবতই, বামপন্থীরা (মস্কোপন্থীদের বাদ দিয়ে) গণচীনের ভূমিকায় বিভ্রান্তিতে থাকলেও, আশাহত হলেও, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে নি। পাকিস্তানীদের সহযোগিতা, বা রাজাকারি করা তো দূরের কথা, তারা বীরত্বের সাথে পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। তোয়াহার নেতৃত্বাধীন অংশটি, যারা একাত্তরের যুদ্ধকে 'দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি' হিসেবে মূল্যায়ন করেছিল, তারাও মূলতঃ একটা কুকুরকেই ঠ্যাঙ্গানি দিতে ব্যস্ত ছিল। যদিও অন্য কুকুরটার কামড় থেকেও আত্মরক্ষা করে চলতে হয়েছিল তাদের। তবে এধরনের অসময়োচিত আর হঠকারি বাগাড়ম্বরের জন্য লাগামহীন অপপ্রচারের আর অপবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদের তখন, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এবং এখনও। সেই সময়ে বামপন্থীদের মানসিক দোলাচল চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে নির্মল সেনের এই কথাগুলোতে [৯],

> "১৯৭১ সালের সংগ্রামে এই ছিল এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। আমি বাঙালি। আমি বাংলাদেশ চাই। আমি চাই বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধে জয়লাভ করুক। কিন্তু আমি জানি এ যুদ্ধে বাঙালির মুক্তি আসবে না। এ যুদ্ধে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে না। ... সুতরাং বাংলাদেশের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত। আমার জন্মভূমির টান আমাকে আবেগমথিত করে। আমার যুক্তি ও প্রজ্ঞা আমাকে বিপরীত কথা বলে।
>
> "১৯৭১ সালের সংগ্রাম তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনের মাঝখানে ছিল এক পর্বতপ্রমাণ দেয়াল। আমি তত্ত্ব দিয়ে বুঝেছি এ সংগ্রাম সঠিক নয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছি। কিন্তু নিত্যদিনের জীবনে এ সংগ্রামকে সফল করার জন্যে সর্বস্ব দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। তবুও বিতর্কের শেষ হয় নি।..."

যাই হোক, ফিরে আসি আবার চট্টগ্রাম শহরে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিনগুলোতে। গভীরভাবে চিন্তা করার পর, ঝুঁকিপূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম সেই নেতৃস্থানীয় কর্মী, যার কথা একটু আগে বলছিলাম, তাঁর উদ্যোগে চাটগাঁ শহর থেকে আমাদের দু'জন দলীয় সহকর্মী সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে। অকথ্য অত্যাচারের পরে একজন মারা যায়, আরেকজনকে মৃতপ্রায় অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কারা যেন ফেলে যায়। সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। অপু, যে মারা যায়, আমার কাছাকাছি বয়সের ছিল, একসাথে মিছিল-সমাবেশ করেছি। তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরে ভীষণ মানসিক আঘাত পেয়েছিলাম আমি। অপু নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ছিল। উপার্জনক্ষম হয়ে পরিবারের হাল ধরবে এই ছিল তার বাবা-মায়ের আশা। কিন্তু অপু শুধু তার পরিবারের কথাই ভাবে নি, ভেবেছিল পুরো দেশের কথা। দেশের মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে, শুধু নিজে বাঁচতে নয়।

চট্টগ্রাম শহরে আমাদের দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সেনাবিরোধী কর্মকান্ডের সাথে তখন যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শফিক ভাই, সৈয়দ শফিকউদ্দিন

আহমেদ (এখন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাটে থাকেন)। তাঁর সাথে যোগাযোগ হলো। মনে হলো আমাকে কাজে লাগাতে চান। যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রথম সাক্ষাতেই জানতে চাইলেন, আমার ভাই- টাই আছে কি না। প্রথমে বুঝি নি, এমন প্রশ্ন কেন। একটু পরেই বুঝলাম, আমি যদি বাবা- মায়ের একমাত্র ছেলে হই, শফিক ভাই প্রাণের ঝুঁকি আছে এমন কাজে আমাকে পাঠাতে চান না। ওনার জন্য মনে নতুন করে শ্রদ্ধা জাগলো। তবে ভাই থাকা না- থাকাটা অন্তত আমার কাছে বিবেচ্য ছিল না তখন। নানা কারণে আমার মন দোদুল্যমান ছিল। তেমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শেষপর্যন্ত আমি যাই নি।

প্রায় পাঁচ মাস পরে কলেজে (চট্টগ্রাম কলেজ) গেলাম। সামরিক সরকার জনজীবনে স্বাভাবিকতা আনার প্রয়াসে কলেজ খুলে দিয়েছিল। এইচএসসি পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে দেশব্যাপী। কাগজে- কলমে আমিও পরীক্ষার্থী। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পরীক্ষা দেবো না। বাবা- মাও সায় দিয়েছেন আমার এই সিদ্ধান্তে। আমি এবং আমার এক সমমনা বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমাদের পরিচিত সব পরীক্ষার্থীদের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি পাঠানো হবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার আবেদেন জানিয়ে। আমরা শহরের একটা প্রেস থেকে প্রচারপত্র ছাপিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারকাজ চালিয়েছিলাম। কাজটা খুব একটা কঠিন না হলেও কিছুটা ঝুঁকি আমরা নিয়েছিলাম।

মজা লাগছিল যখন পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা এই চিঠি পেয়ে তাদের শঙ্কার কথা জানাচ্ছিল আমাদেরই কাছে। আমি আর আমার সেই সহযোগী বন্ধু বাধ্য হয়ে কিছু না জানার ভান করছিলাম। বলেছিলাম, আমরাও এ ধরনের চিঠি পেয়েছি আর পরীক্ষা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অবাক হয়ে দেখলাম আমার চেয়েও রাজনীতিতে (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন) যারা বেশি সক্রিয় ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী। জামাতে ইসলামী সমর্থিত ইসলামী ছাত্র সংঘের অনুসারীরা তো আছেই। শুধু আমার হিন্দু সহপাঠীদের দেখা পাচ্ছিলাম না। খুব দুর্দিন তখন ওদের। হয়তো ভারতের কোন শরণার্থী শিবিরে কষ্টে দিন গুজরাণ করছিল তখন ওরা। হয়তো হানাদারদের হাতে প্রাণ দিয়েছে কেউ। আর কেউ হয়তো প্রাণ হাতে নিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কোথাও। হয়তো ট্রেনিং নিচ্ছে কেউ সীমান্তের ওপারে, কেউ হয়তো অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমেছে দেশের ভেতরেই। কি ভাবে জানবো? জানার কোন উপায় ছিল না। ওদের জন্য মন খারাপ হতো খুব। আর কিছু না হলেও শুধু ওদের কথা ভেবেই আমাদের পরীক্ষা দেয়া উচিৎ হবে না ভেবেছিলাম আমি।

সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন হবে, দুপুরে একাই হেঁটে যাচ্ছিলাম কে.সি. দে রোডের মোড়ে অবস্থিত সিনেমা প্যালেসের দিকে – কেন যাচ্ছিলাম মনে নেই, তবে ছবি দেখতে

নয়। দূর থেকে দেখলাম হোটেল ডালিমের সামনে একদল তরুণ জটলা পাকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। হোটেল ডালিমের মালিক ছিলেন এক হিন্দু ভদ্রলোক। ইসলামী ছাত্র সঙ্ঘের ছেলেরা হোটেলটা দখল করে তাকে আলবদরের ঘাঁটি বানিয়েছে। নুতন নাম দিয়েছে হোটেল সলিম। রং দিয়ে 'ডা'- কে মুছে বানিয়েছে 'স'। শুনেছি এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ধরে এনে অত্যাচার করা হতো।

দেখলাম তাদের মধ্যে একজন আমার চেনা, ছাত্র সঙ্ঘের কর্মী। আমি একটু দূর থেকেই দেখেছিলাম, ছেলেটা আমাকে দেখতে পায় নি। আমার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা তার অজানা নয়। মনে হলো, এই সময়ে, তাও আবার হোটেল সলিমের সামনে, তার চোখে পড়াটা ঠিক হবে না। এবাউট টার্ণ করে উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করলাম আবার। কি ভয়ঙ্কর সময়টাই না গেছে তখন!

মাঝে মাঝেই আলবদরের বা আলশামসের ছেলেরা তাদের চোখে সন্দেহভাজনদের বাড়ি- বাড়ি তল্লাশি করতো। আমার এক সহপাঠী বন্ধুকে তারা ধরে নিয়ে গেল তাদের ঘাঁটিতে, অপরাধ – তার কাছে শংকরের লেখা 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' বইটা পাওয়া গেছে। যারা বইটা পড়েছেন তারা জানেন এটি কোন রাজনৈতিক বা 'দুই বাংলার এক হওয়া' নিয়ে লেখা কোন বই নয়। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' শংকরের আমেরিকা ভ্রমণ আর আমেরিকায় প্রবাসী, তাঁর দেখা বাঙালিদের নিয়ে লেখা। কিন্তু ধর্মান্ধদের কাছে বইয়ের শিরোনামটাই তার অধিকারীর অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল তখন, বিজাতীয় শক্তি কর্তৃক অধিকৃত আমার জন্মভূমিতে।

আমার বন্ধুটিকে তার বাবা অবশেষে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি একটা বীমা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। সেখানে সেক্রেটারির কাজ করতেন আকর্ষণীয় ফিগারের অধিকারী এক তন্বী- তরুণী, নাট্যাভিনেত্রী। তার সাথে নাকি পাক আর্মি অফিসারদের দহরম- মহরম ছিল। অনন্যোপায় হয়ে তার শরণাপন্ন হলেন আমার বন্ধুটির বাবা। শুনেছিলাম, কাজ হয়েছিল ওতেই।

আমাদের পাড়ার তরুণদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তথ্য সংগ্রহের কাজ করতেন। এমন একজন ছিলেন ছাত্রলীগের কর্মী মনসুর ভাই। একদিন আমার বাবার বন্ধুস্থানীয় একজন সরকারী অফিসার বাবাকে খবর দিলেন, পাড়ার কিছু তরুণ যুবকের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে - তিনি জানতে পেরেছেন গোপন সূত্রে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দুই ভাইয়ের নাম এই লিস্টে ছিল না। যাদের কথা বললেন, তাঁর ধারণা, এদেরকে অচিরেই ধরে নিয়ে যাবে আর্মি। তাদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত, মনসুর ভাই। সাথে সাথে মনসুর ভাইকে খবর দিলাম।

কেন জানি না, তিনি পাত্তা দিলেন না, গা ঢাকাও দিলেন না। সপ্তাখানেকের মধ্যে কারা যেন তাঁকে একরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। আর তাঁর খবর পাওয়া যায় নি। স্বাধীনতার পরে চট্টগ্রাম শহরে ছাত্রলীগ তাদের কার্যালয়ের নাম দেয় মনসুর ভবন।

মনসুর ভাইয়ের মতো এমন অনেকেই হারিয়ে গেছেন, দেশের মুক্তি চেয়ে, দেশের মানুষকে ভালোবেসে। মনসুর ভাইয়ের নামে তবুও একটা ভবনের নাম হয়েছিল। সেই যে অপুর কথা বলেছিলাম, তার নামে কিছুই হয় নি।

পাড়ায় যুবা বয়সের এক হিন্দু ভদ্রলোকের সাথে দেখা হতো, কথা হতো। কেরানির চাকরি করতেন কোন এক সরকারি অফিসে। কেন জানি না, উনি দেশেই থেকে গিয়েছিলেন, ভারতে যান নি। একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে আর চাকরি করবেন না, একটা দোকান দেবেন, স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে উপার্জন করবেন। দোকানের নাম হবে 'বাংলাদেশ স্টোর'। স্বাধীনতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আরো অনেক গভীরতর স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল তাঁর মনে। স্বাধীন দেশ আর মুক্ত জীবনের স্বপ্ন একাকার হয়ে গিয়েছিল তাঁর চোখে। এরি মধ্যে একবার সপ্তাহান্তে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেন নি। বাস থেকে নামিয়ে আরো কয়েকজনের সাথে তাকেও পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলি করে মারে। হতভাগ্য সেই ভদ্রলোকের নাম এখন আর আমার মনে নেই, চেহারাটা এখনো স্মৃতির পটে উজ্জ্বল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। গ্রামে- গঞ্জে যুদ্ধও করেছিলেন তাঁরাই। কৃষক, শ্রমিক আর তাদের সন্তান, ছাত্রযুবারা। আর তাঁদের অধিকাংশ যুদ্ধ করেছিলেন দেশে থেকেই। তাঁদের রক্ত ঝরেছে দেশের মাটিতে। ভারতে গেলেও ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র নিয়ে দ্রুতই তাঁরা ফিরে এসেছেন দেশে যুদ্ধের জন্য। যাঁরা ট্রেনিং আর অস্ত্র দেশের মাটিতেই পেয়েছেন, তারা ভারতে গিয়ে সময় নষ্ট করেন নি। ভারতে অবকাশযাপনের মতো করে সময় কাটিয়েছেন মূলত রাজনীতিকেরা। আর উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের কয়েকজন। এমন কি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীও। তিনি নাকি গেরিলা যুদ্ধকে যুদ্ধই মনে করতেন না।

অথচ, মুক্তিযুদ্ধের আলোচনায় সাধারণ লুংগি- গেঞ্জি পরা যোদ্ধাদের কথা বলাই হয় না। শোভারানী মন্ডল বা আলমতাজ বেগমদের মতো গ্রাম্য মেয়েদের কথাতো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ঠাঁই পায় নি। তাঁরা বামপন্থীদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিল সে দোষে তো বটেই তবে সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় এই যে, এঁরা গ্রাম্য চাষা- ভূষা- মজুর শ্রেণীর মানুষ ছিল।

সাহেব-বাবুদের সামনে আজীবন বিনয়ে বিগলিত হতে অভ্যস্ত যে কৃষক, শহুরে বড়লোকদের লাথি-লাঠিতে গা সওয়া যে শ্রমিক, আর তাঁদের সন্তানেরা - আমি তাঁদেরকেই দেখেছি অসীম সাহসের সাথে, তীব্র আত্মমর্যাদার অনুভূতি নিয়ে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। কিন্তু কোন কৃষক পেয়েছেন বীর প্রতীক উপাধি, কোন শ্রমিককে দেয়া হয়েছে বীর উত্তম খেতাব, আমি শুনি নি।

এতে মর্মাহত হয়েছি, বিস্মিত হই নি। যুদ্ধের কর্তৃত্বটা যাদের হাতে ছিল তাদের শ্রেনী চরিত্রের কারণে এর অন্যথা হতে পারতো না।

এরি মধ্যে শীতকাল এসে গেল। কিন্তু শুকনো মওসুমের সুবিধা নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের যুদ্ধ করার খায়েশ বুঝি আর মিটলো না। ভারত সরকার আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উভয় পক্ষের কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। জাতিসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসছে ঘন ঘন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাকিস্তানী লবি চাচ্ছে ভারতকে ঠেকাতে তথাকথিত যুদ্ধবিরতি চাপিয়ে দিয়ে। আর অন্য দিকে ভারতের অভিপ্রায় হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে পাকবাহিনীকে পরাভূত করা আর আওয়ামী লীগের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোভিয়েত রাশিয়া আছে ভারতের পক্ষে।

ভারত কি সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? প্রশ্নটা আর 'যদি' দিয়ে শুরু হয় না, শুরু হয় 'কবে' বা 'কখন' দিয়ে। অবশেষে ডিসেম্বরের তিন তারিখ থেকে আকাশযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চট্টগ্রামে আমরাও প্রতিদিন ভারতীয় যুদ্ধবিমানের গগনবিদারী আওয়াজ শুনতে থাকলাম। এই যুদ্ধে যে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় অত্যাসন্ন এ সত্যটা সবাই উপলব্ধি করতে পারছিল তখন।

বিবিসি'র খবরেই সব জানা হতো। লুকিয়ে বিবিসি শুনতাম আমরা। পাড়ার আলবদর-আলশামসদের উপদ্রব ছিল। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো তারা কেউ বিবিসি বা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছে কিনা দেখার জন্য।

রেডিও পাকিস্তানের খবরও শুনতাম আর হাসতাম। সরকার কবীরউদ্দিন বাংলায় খবর পড়তেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। একবার শুনলাম, "আমাদের *সোনারা* বীরবিক্রমে..."। আমাদের 'সেনারা' বলতে গিয়ে বলেছেন আমাদের 'সোনারা'। ইচ্ছে করে এমনটা বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে সেই বিপদের মধ্যেও একচোট হেসে নিলাম আমরা। প্রতিবেশীদের একজনের মন্তব্য এখনো কানে বাজে, "আহারে, সোনারা!"

খবরে জানা গেল বঙ্গোপসাগরে কাছাকাছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছে পাকিস্তানের পক্ষে। এই খবরে উদ্বিগ্ন আমরা। ভারত- সোভিয়েত অক্ষকে ভয় পাইয়ে জাতিসঙ্ঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গেলানো ছিল এই আস্ফালনের উদ্দেশ্য। কাজ হয় নি তাতে। সোভিয়েত রাশিয়া সময়মতো নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দিয়ে ঠেকিয়ে দেয় যুদ্ধবিরতি। ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর পতন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

পাড়ার বিহারী প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্ন। পাশার দান উলটে গেছে তাদের জীবনে। কিছুদিন আগেও তারা দাপটের সাথে হেঁটে বেরিয়েছে রাস্তায়।

ষোলই ডিসেম্বর। ঢাকার পতন হয়েছে। বিকেলে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেছেন আত্মসমর্পণকারী নিয়াজী আর বিজয়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর অরোরা।

১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৭১ – নিয়াজীর আত্মসমর্পণ

সতেরই ডিসেম্বর, ঊনিশশো একাত্তর। শুক্রবার। বিজয় দিবসের পরের দিন। কিন্তু চট্টগ্রামে সেদিনই আমরা প্রথম বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছিলাম। আগেরদিন ঢাকায় যে কি হচ্ছে তা নিয়ে অনেক জল্পনা- কল্পনা শুনেছি, নিশ্চিতভাবে কিছু জানার উপায় ছিল না। মা বললেন, ভারত যেদিন স্বাধীন হয়েছিল (সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট) সেদিনটাও শুক্রবার ছিল। মা'রা তখন কোলকাতায় ছিলেন। সেই কবেকার কথা, কিন্তু তাঁর তখনও মনে ছিল। আজ এত বছর পরে আমারও মনে আছে একাত্তরের সতেরই ডিসেম্বর শুক্রবার ছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে পরলাম। বেরোতেই দেখলাম, এক চুনোপুটি রাজাকারকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে পাড়ার ছেলেপিলেরা। পালাবার সুযোগ পায় নি বদমাইশটা।

সাধারণ মানুষের চোখেমুখে আনন্দ। বিরাট এক ফাঁড়া থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। পাক মিলিটারির হাতে বেঘোরে প্রাণ হারাবার ভয়টা আর নেই। যুদ্ধের সেই নয় মাস মৃত্যু আমাদের খুব কাছেই ছিল, অদৃশ্য সাপের মতো যেন পায়ের কাছেই ঘুরঘুর করছিল, ছোবল মারার অপেক্ষায়। বেঁচে যে গেছি, সেটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার। মনে আছে যুদ্ধের পরে কলেজে বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা হলে স্বাভাবিক সম্ভাষণ ছিল, "বেঁচে আছিস তাহলে"!

ভারতীয় সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে শহরের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র স্টেডিয়াম সংলগ্ন সার্কিট হাউস ভবনে। ভবনের চত্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেপাইরা।

মানুষ এদের দেখে আমোদিত। হাত মেলাতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। 'স্ট্যান্ডএটইজ' ভঙ্গীতে দাড়ানো কৃশকায়, সমরক্লান্ত, ভিন্নভাষী ভারতীয় সৈন্যদের কেউ কেউ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তরে হাত এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না।

সার্কিট হাউস থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। নানা চিন্তা মনে আসতে থাকলো। আমরা কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম, হিসেব মেলাতে পারছিলাম না। তখনই মনে হয়েছিল, দেশের 'মুক্তিযুদ্ধ' হয়তো শেষ হয়েছে, গণমানুষের মুক্তির যুদ্ধ শেষ হতে এখনো অনেক বাকী।

তথ্যসূত্র – দশম ও শেষ পর্ব

[১] "বামপন্থীদের আরেক অংশ মনি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলিতভাবে বাহিনী গড়ে তুলেছিল, যা ছিল সরকারি মুক্তিফৌজ থেকে স্বতন্ত্র। ভারত সরকার তাদের স্বতন্ত্রভাবে ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর কারণে ভারত সরকার এটা করতে বাধ্য হয়েছিল"।

হায়দার আকবর খান রনো, "ফিরে দেখা বিজয় দিবস", *দৈনিক আমারদেশ,* ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭। http://events.amardesh.com/articles/33/1/aaaa-aaaa-aaaa-aaaa/Page1.html

[২] হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে,* তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৭৬।

[৩] "ইতিমধ্যে আমাদের দলের কিছু ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওরা কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া সীমান্তে ঢুকেছিলো। ..... ওখানে ওরা মুক্তিবাহিনীর শিবির গড়ে তুলেছে। ওটাই বোধ হয় ভারতের মাটিতে প্রথম মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প। ওখান থেকে আমাদের কিছু কিছু ছেলে ট্রেনিং নেবার জন্যে বিহারের চাকুলিয়ায় গিয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে গেছে যুদ্ধ করার জন্যে। তবে পরবর্তীকালে এই ক্যাম্পটি নিয়ে একটি ভিন্ন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই ক্যাম্প সফরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও প্রধান সেনাপতি ওসমানী এসেছিলেন। ছেলেদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা সরকার এই ক্যাম্পটিকে বাতিল করেন। কারণ এই ক্যাম্প বামপন্থীদের দখলে। ৭১ সালের এই ঘটনা আজকে অনেককে হয়তো অবাক করবে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা সেকালে অনেক ঘটেছিলো। যা আজকে বিশ্বাসযোগ্য নয়"।

নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ ২৭৮।

একই বইয়ের অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন,
"আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, দলীয় পরিচয় দিয়ে এখানে কোন প্রশিক্ষণ নেয়া যাবে না। ব্যক্তি হিসেবে আমি পরিচিত বলে হয়তো কিছু সুযোগ সুবিধা পাবো। কিন্তু আমাদের দলের কারো পক্ষে সরাসরি রিক্রুট হয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যাওয়া সম্ভব নয়। রিক্রুটের কালে রাজনৈতিক পরিচয়ই হবে বড় পরিচয় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে প্রশিক্ষণের জন্যেও গ্রহণযোগ্য হবে না" ।

নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ ২৭৫।

[৪] বাড়িপোড়া ছাই ছুঁয়ে পাঁচ ভাইবোন শপথ নিই দেশ শত্রুমুক্ত করব, "প্রিয় মুক্তিযুদ্ধ",
Submitted by Tuhin Khandakar on Mon, 2011/03/21,
http://mj.priyo.com/node/595

[৫] " আমার নেতৃত্বেও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ হয়েছিল। ঝালকাঠির গাবখান চ্যানেল দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি স্পিডবোট যাচ্ছিল। খবরটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সেখানে ছয়- সাতজন মিলে হামলা চালাব। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র আমাদের ছিল না। সিরাজ শিকদারের নির্দেশে আমি গেরিলা কায়দায় পাকিস্তানি গানবোটে গ্রেনেড আর হাতবোমার হামলা করি। আমার হামলায় গানবোট নদীতে ডুবে যায়। এবারও গানবোটের সব পাকিস্তানি সৈন্য মারা যায়"।

একাত্তরের বিজয়িনীঃ শত্রুর গানবোট গ্রেনেড মেরে ডুবিয়ে দিই, *নিউজ বাংলা*, http://www.news-bangla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6081&Itemid=53

[৬] "সিরাজ শিকদার ছিলেন এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। তিনিই আমাকে ট্রেনিং দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে- শুনিয়ে মুক্তিবাহিনীতে নেন। সেখানে তিনি ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দিতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের অপারেশন করতে পাঠাতেন"।

শোভা রানী মন্ডল, স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে যাই, *প্রথম আলো*, তারিখ: ১৬- ১২- ২০১০।
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-04-08/news/116204

[৭] "শিবপুর থেকে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। এছাড়া ভারতের কলকাতা ও আগরতলা থেকেও মুক্তাঞ্চলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা হয়েছিল। সমন্বয় কমিটির যুদ্ধ কৌশল ছিল দ্বিবিধ। এক, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাঁটি গড়ে যুদ্ধ করা। সে ক্ষেত্রে প্রধানত শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রই ছিল আমাদের অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান উৎস। আমরা ভারত সরকারের কোনো রকম সাহায্য পাইনি। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আমাদের কর্মীদের ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ মুক্তিবাহিনীতে রিক্রুট করার ক্ষেত্রে বাম কমিউনিস্ট ন্যাপ কর্মীদের বাদ দেওয়ার নির্দেশ ছিল। তবে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নুরুজ্জমান (তিনি নিজেও মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন), মেজর জলিল, মেজর মনজুর আহমেদ প্রমুখের যথেষ্ট সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম। তারা বামপন্থীদের ঘাঁটি এলাকায় অস্ত্র সরবরাহ পর্যন্ত করেছিলেন। বামপন্থীদের পক্ষে সবচেয়ে আন্তরিক ছিলেন সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নুরুজ্জমান"।

হায়দার আকবর খান রনো, "ফিরে দেখা বিজয় দিবস", *দৈনিক আমারদেশ*, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭।
http://events.amardesh.com/articles/33/1/aaaa-aaaa-aaaa-aaaa/Page1.html

অন্য এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন,
"যুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যায়নে ভ্রান্তি থাকলেও ইপিসিপি (এল)- এর বিভিন্ন অংশও বিচ্ছিন্নভাবে সাহসী যুদ্ধ করেছেন। যেমন নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ এলাকায় যথা চর জঙ্গলিয়া ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে ঘাঁটি এলাকা তৈরি হয়েছিল মহম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে। সশস্ত্র তৎপরতা রামগতি ও সুধারাম থানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবেন শিকদার- আবুল বশারের নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিএম কলিমুল্লাহর নেতৃত্বে চাঁদপুরে এক বিশাল বাহিনী ও ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠেছিল।

ঢাকায় যুদ্ধরত ক্র্যাক প্লাটুনেও ছিলেন বামপন্থী ছাত্রকর্মীরা। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির অধীনস্থ বরিশাল অঞ্চলের যুদ্ধ (অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন), কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম অঞ্চলের যুদ্ধ, বাগেরহাটে রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ ও বিশাল গেরিলা বাহিনী এবং সাতক্ষীরার তালা থানায় কামেল বখতের নেতৃত্বাধীন গেরিলা সংগ্রাম বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে"।

হায়দার আকবর খান রনো, স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা, *সাপ্তাহিক বুধবার*, ২৪- ৩- ২০১১।
http://budhbar.com/?p=4681

[৮] লেঃকঃ তাহের, মুক্তিযোদ্ধারা আবার জয়ী হবে,
http://www.col-taher.com/writtings3.html

[৯] নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ ৩২১।